বাতায়ন

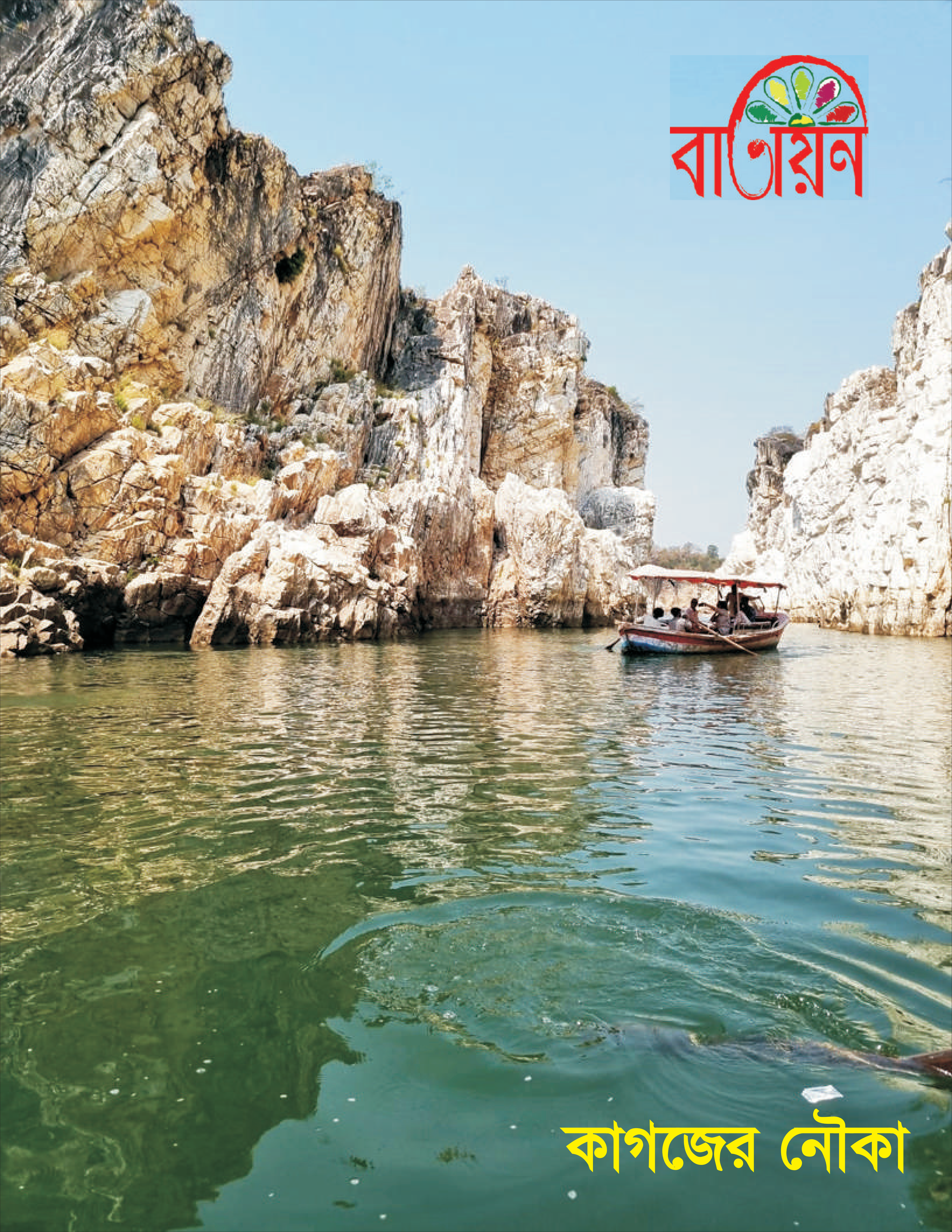

কাগজের নৌকা

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

২৯তম সংখ্যা, আগস্ট ২০২৬

সম্পাদনা

সঞ্জয় চক্রবর্তী

Issue Number 29 : August, 2026

Editor

Sanjoy Chakraborty
Sydney

Chief Editor

Ranjita Chattopadhyay
Chicago

Sub Editor

Sugandha Pramanik
Sydney

Design and Art Layout

Kajal & Subrata, Kolkata

Website Design and Support

Susanta Nandi, Kolkata

Published By

BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Concept & Production

Anusri Banerjee, CEO

Photo & Artwork Credit

Amit Rudra **Front Cover**
Perth, Australia

Amit is a retired academic who taught and researched for over three decades in various areas of Data Science - data mining, business intelligence and enterprise systems. Although he has a couple of books and several research articles to his credit he is an avid globe trotter who has visited or lived in nearly three dozen countries in almost all inhabited continents of the world. Of all the things in nature, the smell of sulphur from volcanoes, water and open vehicle jungle safaris attract his passion. He spends his time as a Digital Mentor for seniors and wood turning creating exotic designs.

Saumen Chattopadhyay **Front Inside Cover**
IL, USA

Saumen is an avid outdoor enthusiast and enjoys hiking, trekking, and photography. He also takes part in recitation, drama, mind science. Saumen is an entrepreneur in the field of investment research and portfolio management. He lives in Chicago.

Supratik Mukherjee **Title Page & Back Cover**
Perth, Australia

সুপ্রতীক মুখার্জী । পার্থিব বাসিন্দা । প্রজ্ঞা-পিয়াসি ।

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত । প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ । রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

ইতিহাসে এমন কিছু জাহাজ আছে যা কেবল সমুদ্রই পেরোয়নি, মানুষের কল্পনা, সাহস আর সভ্যতার সীমানাকেও এগিয়ে নিয়ে গেছে। গোল্ডেন হিন্ড (Golden Hind) তেমনই একটি জাহাজ। ১৫৭৭ থেকে ১৫৮০ সাল অব্দি স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক সেই জাহাজের হাল ধরে অজানা সমুদ্রের পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন ভূপর্যটনে। সামনে ছিল অনিশ্চয়তা, অচেনা জলরাশি আর অজানা ভূখণ্ড। তবুও যাত্রা থামেনি। কারণ প্রতিটা অভিযানের পেছনের মূল চালিকাশক্তি ছিল নতুন কিছু জানার অদম্য ইচ্ছা।

"কাগজের নৌকা"-ও আমাদের কাছে অনেকটা সেই গোল্ডেন হিন্ডের মতোই। শুধু পার্থক্য হলো, এর পাল কাগজের, এর হাওয়া ভাষার, আর এর সমুদ্র মানুষের অনুভূতির। এই নৌকার গন্তব্য কোনও নতুন মহাদেশ নয়, এর গন্তব্য মানুষের মন।

প্রকাশিত হলো কাগজের নৌকার ঊনত্রিশতম সংখ্যা। একটা সাহিত্যপত্রিকা কখনও শুধু কিছু লেখা একসাথে জমায়েত নয়। এটা একটা যাত্রা। এখানে কবিতা কম্পাসের মতো পথ দেখায়, গল্প হয়ে ওঠে দিগন্ত, প্রবন্ধ বাতিঘরের মতো আলো দেয়, স্মৃতিকথা নোঙরের কাজ করে, আর পাঠকের জানার আগ্রহই সেই বাতাস যা নৌকাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সম্পাদক শুধু হাল ধরে থাকেন; আসল শক্তিটা আসে লেখক, শিল্পী এবং পাঠকের সম্মিলিত বিশ্বাস থেকে।

আজকের পৃথিবী প্রযুক্তির নানা বিস্ময়ে ভরা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রতিদিন নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিচ্ছে। তথ্যের স্রোত আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক দ্রুত। অথচ এই অবিশ্বাস্য গতির মধ্যেই মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো একটু থামা, নিজেকে শোনার সুযোগ। সাহিত্য সেই বিরল সুযোগ এনে দেয়। সাহিত্য আমাদের মনে করিয়ে দেয় – মানুষের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার যন্ত্র নয়, অনুভব।

এই সংখ্যার প্রতিটি লেখা সেই অনুভবেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কেউ স্মৃতির নদী বেয়ে এসেছেন, কেউ বর্তমানের ঢেউয়ের মধ্যে দিয়ে, আবার কেউ ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে। পৃথিবীর নানা প্রান্তে থাকলেও বাংলা ভাষা আমাদের একই সমুদ্রের জল, একই আকাশের তারা। ভৌগোলিক দূরত্ব যতই হোক না কেন, এই ভাষা আমাদের একই নৌকায় তুলে আনে।

স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক কখনও জানতেন না পরের দিন সকালে কোন দ্বীপ তার সামনে ভেসে উঠবে। আমরাও জানি না এই কাগজের নৌকা কোন পাঠকের মনে আজ জায়গা করে নেবে, কোন নতুন লেখকের হাতে আগামী দিনের আলো জ্বালাবে, অথবা কোন পুরোনো স্মৃতিকে আবার নতুন করে জাগিয়ে তুলবে। এই অনিশ্চয়তাতেই সাহিত্য বেঁচে থাকে, আশায় বুক বাঁধে।

নদীকে ভালোবাসতে হলে তার শেষ দেখতে নেই, সমুদ্রকে ভালোবাসতে হলে দিগন্তের ওপর বিশ্বাস রাখতে হয়। সাহিত্যও তেমনই, শেষ পৃষ্ঠা কখনও শেষ নয়; বরং সেখান থেকেই পাঠকের মনে শুরু হয় এক নতুন যাত্রা।

তাই আসুন, আমরা আবার এই কাগজের নৌকায় চড়ি। যেমন ক্যাপ্টেনের হাতে থাকে দিকনির্দেশ, তেমনই যাত্রীদের চোখেও থাকে স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন, সেই বিশ্বাস আর বাংলা ভাষার অফুরন্ত সম্ভাবনাকে সঙ্গে নিয়েই আমাদের এই যাত্রা চলুক।

পড়তে থাকুন। যাত্রা শুভ হোক।

সঞ্জয় চক্রবর্তী
সিডনী

সূচীপত্র

কবিতা

তপনজ্যোতি মিত্র	**কোথায় রাখো তোমার কবিতা**	5

গল্প

শান্তনু চক্রবর্তী	**মেক্সিকো – প্রথম প্রবাসে**	6

ধারাবাহিক গল্প

প্রতীপ ভট্টাচার্য	**উত্তর কলকাতায়**	17
শাশ্বতী বসু	**পিজা পাস্তার দেশে**	23

ধারাবাহিক উপন্যাস প্রবন্ধ

স্বপ্না মিত্র	**পাহাড় চুড়ো**	29

Book Review 41

তপনজ্যোতি মিত্র

কোথায় রাখো তোমার কবিতা

কোথায় রাখো তোমার কবিতা ?
কোন দূর দেশে ?
তারপর কি করে পৌঁছাও সেখানে ?
সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে ?

তোমার জন্যে কি তোমার কবিতারা অপেক্ষা করে ?

যেন তুমি এলেই
খুলে যাবে তাদের দিগন্ত,
তাদের আকাশ,
তাদের বন্ধ জানালাদরজা

যেন তুমি এলেই
ডাক দেবে সেই ভুবনভাঙার মাঠ,
আর সেই মাঠের ওপারে এক দিগন্তভোলা উদাস পৃথিবী

যেন তুমি এলেই
হাজার কবিতারা কথা বলে উঠবে,
তাদের সঙ্গী হবে হাজারো অসমাপ্ত গল্প

যেন তুমি এলেই
হারিয়ে যাওয়া নদীরা ফিরে আসবে,
কবিতার মতো বেজে উঠবে তাদের কলকাকলি

যেন তুমি এলেই
তোমার কবিতারা পান করবে আকণ্ঠ তৃষ্ণার জল

যেন তুমি এলেই
ঘুম ভেঙে জেগে উঠবে কবিতার ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি

যেন তুমি এলেই
যেন তুমি এলেই
যেন তুমি এলেই

তপনজ্যোতি মিত্র – সিডনির বাসিন্দা, পেশায় আই. টি.। কাজের শেষে প্রতিদিন বইয়ের জগতে ফিরে যান। রবীন্দ্রনাথ/জীবনানন্দ সহ বিভিন্ন লেখকের লেখা পড়ার মাঝে কখনো সখনো নিজেরও দু এক লাইন লেখার বিনীত প্রয়াস। বিভিন্ন প্রকাশিত গল্প কবিতা 'বসন্তের জলাশয়ে প্রতিচ্ছবি', 'অমৃতের সন্তানসন্ততি', 'ঈশ্বরকে স্পর্শ', 'মায়াবী পৃথিবীর কবিতা', 'সুধাসাগর তীরে', 'সে মহাপৃথিবী', 'আকাশকুসুমের পৃথিবী' । কবিতা আবৃত্তি ও গল্প পাঠের বাচনিক শিল্পও করতে ভালবাসেন।

শান্তনু চক্রবর্তী

মেক্সিকো – প্রথম প্রবাসে

।। ১।।

ভারত থেকে মেক্সিকো? তাও, ড্রাগ ব্যবসায়ে যুক্ত হবার জন্য বা মারিয়াচি নাচবার জন্য বা ফুটবল খেলবার জন্য নয়, পড়াশুনোর জন্য? সেও আবার কেউ যায় নাকি? লোকজন তো আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানি যায় পড়াশুনো করতে! সেখানে মেক্সিকো যাওয়া কি এক ধরনের অবনমন নয়? আমার এক আত্মীয় তো আমি মেক্সিকো যাচ্ছি শুনে ঠাট্টা করে বলেছিলেন 'মাক্কু ল্যান্ড'! আমি জানি না এই শব্দযুগলের মানে কী, কিন্তু শুধু ভারতে বসবাসকারী ভারতীয়রা নয়, আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের কাছেও মেক্সিকো হল সেই দেশ যেখান থেকে দলে দলে লোকজন রোজ বেআইনীভাবে সীমানা পেরিয়ে আমেরিকায় ঢোকে একটু ভালোভাবে বাঁচবার জন্য, এবং এসেও তারা দিনমজুরের চাকরীর বেশী আর কিছু জোটাতে পারে না। এদের এভাবে আসা আটকানোর জন্য আমেরিকাকে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া বসাতে হয়! এ রকম একটা দেশে আমি গেলাম কেন ? কীসের আশায় ? আর এতো ভালো ভালো দেশ থাকতে মেক্সিকোই বা যাওয়া কেন ? আসল কথা হল আমি অন্য কোথাও পাই নি যে !

আসলে কলকাতার বরানগরের ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটে পি এইচ ডি করতে করতে রিজার্ভ ব্যাংকে ঢুকে পড়লেও একবার ব্যাংক থেকে ছুটি নিয়ে পি এইচ ডি-টা শেষ করে ফেলার পর থেকে আমার পরিকল্পনা হল অ্যাকাডেমিকসে ফেরা। প্রথমে ইচ্ছে ছিল ভারতেরই কোনো ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট-এ কোথাও চেষ্টা করবো। কিন্তু আমার পি এইচ ডি গাইড বি ভি রাও থেকে শুরু করে অনেকেই বললেন আমার বিদেশে চেষ্টা করা উচিত। শেষ পর্যন্ত আমিও মেনে নিলাম। এদিকে পি এইচ ডি শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমার কলকাতা থেকে মুম্বাইতে ট্র্যান্সফার হয়ে গেছে। রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃপক্ষর ইচ্ছে আমাকে আরও বেশী করে রিজার্ভ ব্যাংকের কাজে জড়িয়ে ফেলা। কিন্তু আমার যেহেতু অন্য ভাবনা, তাই মুম্বাইতে এসে থিতু হতে কয়েকটা মাস নেবার পরই আমি শুরু করলাম আই এম এস (ইনস্টিটিউট অফ ম্যাথমেটিক্যাল স্ট্যাটিসটিক্স)-এ চাকরির বিজ্ঞাপনগুলো দেখে অ্যাপলাই করা। আমি অ্যাপলাই করলাম গোটা চার পাঁচ জায়গায়, তার মধ্যে একমাত্র মেক্সিকোর গুয়ানাখুয়াতো শহরে অবস্থিত সেন্ট্রো দে ইনভেস্তিগাসিওন এন মাথেমাতিকাস (সংক্ষেপে সিমাত) থেকে একটা অফার পেলাম – পোস্টডকের অফার। সেখানকার প্রফেসর হোসে আলফ্রেদো লোপেজ মিমবেলা আমাকে ওঁর ছাত্র হবার জন্য নির্বাচিত করেছেন। আমি ইন্টারনেটে সার্চ করে দেখলাম – মেক্সিকো যেমনই দেশ হোক না কেন, এই ইনস্টিটিউট-টি কিন্তু নামকরা। ভালো ভালো ফ্যাকাল্টিরা রয়েছেন, তাঁদের কাজের মান আই এস আই-এর ফ্যাকাল্টিদের থেকে কিছুমাত্র নিম্নতর নয়। তাই আমি ঠিক করলাম যে যাবো। আর রিজার্ভ ব্যাংকের চাকরী ছেড়ে নয়, ছুটি নিয়ে। কারণ পোস্টডক তো আর পার্মানেন্ট চাকরী নয়! কিন্তু এই ছুটি পাওয়াই হয়ে গেল এক ঝকমারি ব্যাপার! প্রিন্সিপাল অ্যাডভাইজার সান্তানাম আমাকে বলেছিলেন, "তোমরা এসব কী শুরু করেছো বলো দেখি ? এরকম হলে অফিসের কাজকর্ম কী করে চলবে ?" উনি পরিষ্কার লিখে দিলেন "নামঞ্জুর"। কিন্তু আমারও যে প্ল্যান রয়েছে! অন্ততঃ একটিবারের জন্য তো আমাকে চেষ্টা করতে হবে ঠিকঠাক করে পড়াশুনো করে ভালো কিছু করার! তাই আমি লেগে থাকলাম। আমার মনে হল শেষ পর্যন্ত আমি সফল হবোই।

এরপর কিছুদিন ধরে চলল প্রস্তুতিপর্ব – মেক্সিকোর ভিসা নেয়ার জন্য দিল্লী যাওয়া, ট্র্যাভেল এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করা, স্প্যানিশ শেখা, আমার মেক্সিকোর সুপারভাইজার মিমবেলাকে আমার দেরীর ব্যাপারে জানানো ইত্যাদি। হ্যাঁ, ছুটি সঙ্গে সঙ্গে নামঞ্জুর হওয়ায় দেরী হওয়াটা প্রত্যাশিত ছিল। মিমবেলা বললেন – যখন আমি গিয়ে

পৌঁছোবো, তখন থেকেই আমার এক বছরের গণনা শুরু হবে। দিল্লীতে গিয়ে ভিসা পেতে অসুবিধে হয় নি। কিন্তু সেখানকার ভিসা অফিসার মিস্টার পারেদেস বলেছিলেন – আমি যদি আমার ছুটি মঞ্জুর হওয়ার কাগজ দেখাতে না পারি তো ওঁর বসেরা ওঁর গলা কেটে নেবেন। তাই ভিসা হাতে পেলেও চুপচাপ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবো, সে সম্ভাবনা নেই। ট্র্যাভেল এজেন্ট মিস্টার বামনের অফিস আমার মুম্বাইয়ের বান্দ্রাকুর্লা কমপ্লেক্সের অফিসের থেকে হাঁটা দূরত্বে। সেখানে সুযোগ পেলেই চলে যেতে লাগলাম। মিস্টার বামনকে বলে রাখলাম আমার যাওয়ার দিনের অনিশ্চয়তার কথা। উনি বলেছিলেন উনি আমার কথা মনে রাখবেন।

স্প্যানিশ শিখতে শুরু করলাম শনিবার শনিবার অফিস থেকে ফেরার পথে তাহিল ভামবোয়ানি নামে এক ভদ্রলোকের কাছে। ওঁর বাড়ী খারে। উনি সম্ভবতঃ ইংলিশ ও স্প্যানিশ – এই দুটি ভাষাই জানেন। নিজের মাতৃভাষা সিন্ধি জানেন কিনা আমার আর জানা হয় নি। আমি ওঁর কাছে চারটি মতো লেসন নিয়েছিলাম। লাভ হয়েছিল যে, আমি অন্ততঃ সব সংখ্যাকে স্প্যানিশে বলতে শিখে গিয়েছিলাম। একদিন আমি থাকতে থাকতেই ওঁর বোন ঈশ্বরী ফোন করেছিলেন। উনি বোনকে "ওলা ঈশ্বরী" করে সম্বোধন করেছিলেন এবং স্প্যানিশে কথা বলেছিলেন। কারণ ওঁরা সম্ভবতঃ ছোটোবেলা এমন জায়গায় বড় হয়েছিলেন, যেখানে প্রথম ও প্রধান ভাষা ছিল স্প্যানিশ। চারটি লেসনের পর আর লেসনের সময় ছিল না। আমি ওঁকে শেষ সাক্ষাতের সময় জিজ্ঞেস করেছিলাম – আমি কি পারবো মেক্সিকোয় গিয়ে কথাবার্তা চালাতে? উনি বলেছিলেন আমি নিজেকে অন্ততঃ ডিফেন্ড করতে পারবো।

শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে যাওয়ার পর আমার ছুটি মঞ্জুর হল। ছুটি মঞ্জুর হতেই আমি প্রমাণপত্র ফ্যাক্স করে পাঠিয়ে দিলাম মেক্সিকো এমব্যাসিতে আর সঙ্গে সঙ্গে মিঃ বামনকে বলে টিকেট বুক করিয়ে নিলাম। তবে তার আগে আবার এক প্রস্থ নানান খবরাখবর নেয়া। বামন বলছিলেন টিকেটের দাম ৯৮,০০০ টাকা। ভাড়া বেশী হওয়ার কারণ হিসেবে বলেছিলেন – আমার ফ্লাইট ইউ এস এ হয়ে যাচ্ছে না, তাই ভাড়া বেশী। এখানে উল্লেখ্য, ইউ এস এ-র ভিসা নিয়ে নানান সমস্যা হয় বলে আমি বামনকে অনুরোধ করেছিলাম ইউ এস এ-র রুটকে এড়িয়ে চলতে। তাই বলে ভাড়া এতো বেশী? আসলে আমি খবর নিয়ে জেনেছিলাম ইউ এস এ যেতে হলে ৬০,০০০ - ৬৫,০০০ টাকায়ই হয়ে যায়, সেখানে মেক্সিকো এতো বেশী কেন? এই প্রশ্নের জবাবেই বামনের এই উত্তর। এরপর আমার মনে এক সন্দেহ উঁকি দিল – উনি বিজনেস ক্লাসের টিকেট ধরিয়ে দেন নি তো? ফাইনাল পেমেন্ট করে টিকেট হাতে পাওয়ার দিন আর থাকতে না পেরে ওঁকে জিজ্ঞেস করে ফেললাম সে কথা। এর যে উত্তরটি উনি দিয়েছিলেন, তা বাঁধিয়ে রাখার মতো। "নাহ্‌, এটি বিজনেস ক্লাসের টিকেট নয়, তবে বিজনেস ক্লাসের সব সুবিধেই আপনি পাবেন।" এ যেন সোনার পাথরবাটি! এই উত্তরের মানে আমি সেদিনই পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিলাম যেদিন আমি শেষ পর্যন্ত গিয়ে প্লেনে উঠেছিলাম। তবে সে কথা পরে।

এতদিন ধরে শুধু নিজের কথাই ভেবে গেছি। কী করে আমার ছুটি হবে আর কী করে আমি যাবো। আমার স্ত্রী লোপার কথা এবং আমাদের পরিবারের আগামী অতিথিকে নিয়ে চিন্তা করিই নি। আমার প্রথম সন্তান স্বদীপ্তর জন্মের দিনও যে দ্রুত এগিয়ে এল বলে! ছ'মাসের প্রেগন্যান্ট লোপা কি পারবে এই অবস্থায় আমার সঙ্গে যেতে? ডঃ সুসান সোডার পরিষ্কার 'না' বললেন। অগত্যা লোপাকে চলে যেতে হবে শিলচরে ওর বাবা-মা'র কাছে। ব্যারাকপুরে আমার মা'র কাছে রেখে যাওয়া অসম্ভব কারণ আমার মা একা মানুষ, লোপার ঠিকমতো যত্ন-আত্তি করতে পারবেন না। ওর বাবা-মা'র কাছে বরং ও ভালো থাকবে। সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা মুম্বাই ছাড়বার প্রস্তুতি নিলাম। আমাদের শখের জিনিসগুলো জলের দরে বেচে যৎসামান্য জিনিস নিয়ে আমরা ব্যারাকপুর এসে উঠলাম। শিলচর থেকে আমার শ্বশুরমশাই এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে ও লোপাকে নিয়ে যেতে।

শেষ পর্যন্ত এতো কাঠখড় পুড়িয়ে যেতে পারছি বলে মনে যেমন আনন্দ ছিল, তেমনি লোপাকে এভাবে ছেড়ে যেতে মনে খুব কষ্টও ছিল। মাকে, লোপাকে এবং অন্যান্য সবাইকে বিদায় জানিয়ে প্রথমে গেলাম মুম্বাই, সেখানে দিন দুয়েক থেকে তারপর আমার ফ্লাইট। মুম্বাইকে চিরবিদায় দেবার আগে মুম্বাইয়ের অন্যতম সৌন্দর্য মেরিন ড্রাইভকে আরেকবার চোখে দেখার ইচ্ছেটা আর দমিয়ে রাখতে পারি নি। এর আগে যখন এসেছিলাম, তখন লোপা ছিল সঙ্গে। এবারে একা

একা কিছুক্ষণ এর সৌন্দর্য আস্বাদ করতে করতে লোপার সঙ্গে এখানে কাটানো সময়ের স্মৃতি কিছুটা রোমন্থন করে নিয়ে তারপর এই রোমান্টিক মহানগরীকে বিদায় জানালাম আমার জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য।

।। ২ ।।

আমি আগেই বলেছিলাম মিঃ বামন আমাকে একটি ৯৮,০০০ টাকার টিকেট ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন এটি বিজনেস ক্লাস নয়, তবে আমি নাকি বিজনেস ক্লাসের সব সুবিধেই পাবো। এরপর প্লেনে উঠেই অবশ্য আমি বুঝতে পেরেছিলাম – আমার সীট বিজনেস ক্লাসের, আমি সব সুবিধেই পাচ্ছি (ক্যাবিন ক্রিউদের ঘন ঘন গরম ঠান্ডা পানীয় নিয়ে আসা-যাওয়া যার অন্যতম), তখনই, বেশ দেরীতে হলেও আমার বোধোদয় হল যে, এটি বিজনেস ক্লাস ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। শুধু শুধু আমাকে এতগুলো টাকা প্লেন ফেয়ার বাবদ দিতে হয়েছিল। তবে আমার সৌভাগ্য সিমাত পরে আমার এই প্লেন ফেয়ার রিইমবার্স করে দিয়েছিল।

মুম্বাই থেকে লুফথানসার ফ্লাইটটি অবশ্যই ছিল অনেক রাত্তিরে। আর সেটি গিয়ে ফ্রাঙ্কফুর্ট পৌঁছেছিল সকালবেলা। পরে জেনেছিলাম এরকমই হয় ইন্ডিয়া থেকে ইউরোপগামী ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটগুলোর বেলায় – গভীর রাত্রে ছেড়ে গন্তব্যস্থলে সকালে পৌঁছোনো। যখন ঢুকলাম এয়ারপোর্টে, তখন ফ্রাঙ্কফুর্টের নিরাপত্তারক্ষীরা আমার পাসপোর্টের ছবির সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন, কিন্তু কিচ্ছুটি জিজ্ঞেস করলেন না। ইউরোপে সকাল হলেও ভারতে তখন দুপুর। আমার সেলফোন ছিল না। তাই ঘড়ির কাঁটাকে ঘুরিয়ে হিসেবমতো পিছিয়ে দিয়েছিলাম। এরপর কলিং কার্ড কিনে মাকে ও লোপাকে ফোন করে আমার পৌঁছোনোর সংবাদ দিলাম। কলিং কার্ড কিনতে গিয়ে ডলার ভাঙাতে হল। এই প্রথম ইউরোর নোট আর কয়েন হাতে এল। ফ্রাঙ্কফুর্টে ছ' ঘন্টা হল্ট। এদিক ওদিকে ঘুরে বেড়িয়ে খাবার কিনে খাবার খেয়ে তারপর আবার ঘুরেও সময় আর যেন ফুরোতে চায় না। অবশেষে যথাসময়ে ফ্লাইটে উঠলাম। কিন্তু ফ্লাইট সঙ্গে সঙ্গে ছাড়ল না। কিছু টেকনিক্যাল ইস্যু ছিল, যার জন্য টেকনিশিয়ানদের খবর পাঠাতে হল। তারা এল, মেরামত করল, কেটে গেল এক ঘন্টা, তারপর ছাড়ল প্লেন। আগের ফ্লাইটে প্রায় আদ্ধেক ভারতীয় ছিল, এবারের ফ্লাইটে ভারতীয় প্রায় নেই বললেই চলে। মুম্বাই টু ফ্রাঙ্কফুর্ট ছিল প্রায় ৮-৯ ঘন্টার ফ্লাইট, আর এটি ১০-১১ ঘন্টার ফ্লাইট। সে সময় সীটে সীটে টিভি স্ক্রিন ছিল না, তাই প্লেন যা দেখাত তাই দেখতে হত। আর আমার মনেও পড়ছে না কিছু দেখিয়েছিল বলে। তাই এই জার্নির মুখ্য কৌতূহল ছিল মীলগুলো। সম্পূর্ণ বিদেশী মীল কেমন হয়, তার প্রথম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল। এই প্রথম বোধহয় সজ্ঞানে চীজ খাওয়ার সুযোগ এল। তখন কে জানত, মেক্সিকোয় পৌঁছে শুধু চীজ আর চীজ-ই চলবে?

মেক্সিকো সিটি এয়ারপোর্ট বোধহয় ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্ট থেকেও বড়। আর বি আই-তে বসে নেট সার্ফিংয়ের সময় জেনেছিলাম মেক্সিকো সিটি হল জনসংখ্যার দিক দিয়ে সবচেয়ে বড়, এখন অবশ্য আর তা নেই। তো যে শহর জনসংখ্যার দিক দিয়ে বড়, সে আয়তনের দিক দিয়েও নিশ্চয়ই কম যায় না! তাই এয়ারপোর্ট থেকে অসংখ্য ফ্লাইট। এয়ারপোর্টের গোলোকধাঁধায় সহজেই হারিয়ে যাওয়া যায়। আর যেখানে স্প্যানিশই বেশী বলা হচ্ছে, আর ইংরেজী বলা হলেও কখন বলা হবে তা প্রেডিক্ট পর্যন্ত করা যাচ্ছে না, সেখানে হারিয়ে গেলে সত্যিই মুশকিল। আমাকে বলা হয়েছিল চেক ইন-এর জন্য ১৭ নম্বর কাউন্টারে যেতে, কিন্তু আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না, আর ক্ষণিকের জন্য তাহিল ভামবোয়ানির শিক্ষা ভুলে গিয়ে স্প্যানিশে ১৭-কে যে দিয়েসিসিয়েতে বলে, সেটাও মনে করতে পারছিলাম না। তাই কাউকে যে জিজ্ঞেস করবো তারও উপায় ছিল না। তবে ভাগ্য ভালো, ইতস্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে বোধহয় পেয়ে গিয়েছিলাম সেই কাউন্টার কাউকে জিজ্ঞেস না করেই। এরপর মেক্সিকো সিটি থেকে লেওনের ফ্লাইটে উঠে আপাতত শান্তি। এটাই এবারের মতো আমার শেষ ফ্লাইট। ফ্লাইট ছাড়তে দেরী হচ্ছিল। এতো দীর্ঘ প্লেন জার্নির পর আমার ফ্লাইট ছাড়বার আগেই ঘুম এসে গেল। তারপর ফ্লাইট ছাড়বার সময় বোধ করি একটুখানি ঘুম ভেঙেছিল, তারপর আবার ঘুম লেগে গিয়ে একেবারে লেওনে নামবার ঠিক আগে ঘুম ভাঙল। অবশ্য মাত্রই ৩৫ মিনিটের এই ফ্লাইট, তবু মনে হল ঘুমটা বেশ আরামের।

মিমবেলা বলেই রেখেছিলেন – যত রাতই হোক, এয়ারপোর্টে সিমাতের লোক থাকবে আর আমাকে রাইড দেবে সিমাতেল অব্দি। সিমাতেল হল সিমাতের গেস্ট হাউস যেখানে গিয়ে আমি উঠবো। যদ্দুর মনে পড়ে, মেক্সিকোর সময় রাত সাড়ে বারোটা হয়ে গিয়েছিল! যে বয়স্ক ড্রাইভার এসেছিলেন আমাকে নিয়ে যেতে, খুবই হাসিখুশী। বেশী কথা বলবার দরকার হয় নি, আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতেই উনি কথা বুঝে যাচ্ছিলেন। তাই ওঁকে দাঁড় করিয়ে রেখে লোপাকে ও মাকে পৌছসংবাদ দিতে অসুবিধে হল না। হ্যাঁ, এখানে উল্লেখ্য, আমি ডলার ভাঙিয়ে কিছু পেসো জোগাড় করেছিলাম মেক্সিকো সিটি এয়ারপোর্টেই। সে সময় এক ডলার মানে এগারো পেসো মতো ছিল। তাই লেওন এয়ারপোর্টে পেসো ব্যবহার করে ফোন করতে অসুবিধে হয় নি একটুও। ফোন করবার পর যাত্রা শুরু হল। অনেক পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে ওঠানামা করে অনেক সুড়ঙ্গ পেরিয়ে ৩০ কিলোমিটার থেকে ১১০ কিলোমিটারের মধ্যে স্পীডোমিটারের কাঁটাকে নড়াচড়া করিয়ে শেষে পৌঁছোনো গেল সিমাতেল। এতো রাত্রে আর খাওয়ার প্রশ্ন নেই। ড্রাইভার ভদ্রলোক একেবারে মালসহ আমাকে তিনতলার নির্দিষ্ট কামরায় পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিলেন। তারপর ঘন্টা দেড়েক ধরে নিজের জিনিসপত্র একটু নাড়াচাড়া করে কিছু দরকারী জিনিস বার করে রুমটাকে একটুখানি গুছিয়ে নিয়ে রাত তিনটেয় চান করে বিছানায় শুলাম। আর পরদিন সকাল আটটায় পাশের গীর্জার ঘন্টার আওয়াজে আমার ঘুম ভাঙল। এরপর তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে ব্রেকফাস্ট করতে নামা।

ব্রেকফাস্ট করতে গিয়েই বোঝা গেল, নিজের কেরিয়ার নিয়ে লড়বার পাশাপাশি আরও একটি লড়াই শুরু হল আমার – ভাষার লড়াই। এখানে যেসব খাবার বানায়, সেসবের নাম আমি জীবনেও শুনি নি। তাই কোনটা খাবো আর কোনটা খাবো না, সেটা যাচাই করা বেশ দুঃসাধ্য। আর ডাইনিং রুমের স্টাফরা কেউই ইংরেজী বোঝে না। যাঁরা অতিথি আছেন, তাঁরা কেউ কেউ বোঝেন, কিন্তু সবটা আমাকে বোঝাতে পারেন নি। একমাত্র আগোয়া মানে যে জল, সেটা আমার মনে ছিল। সবার শেষে যখন আমি সেটি চেয়েছিলাম, তখন মনে হল কিচেনের মেন কুক যেন একটু আশ্বস্ত হলেন – অন্ততঃ একবার আমি বোঝাতে পেরেছি আর উনিও আমার চাওয়ামতো জিনিসটি আমাকে দিতে পারছেন। শেষমেশ আমি জিজ্ঞেসই করে ফেললাম – এই সিমাতেলে কি কেউই নেই যিনি একটুখানি ইংরেজী বোঝেন? তখন কেউ একজন আমাকে আকারে ইঙ্গিতে বোঝালেন – এখানে যিনি কেয়ারটেকার ভদ্রলোক, সেই আংখেল কাররিও, তিনি বোঝেন। একটুখানি নিশ্চিন্ত হয়ে আমি এবারে আমার গন্তব্যস্থল সিমাতের দিকে হাঁটা শুরু করলাম। কেউ আমাকে সাহায্য করেছিলেন কিনা ঠিক মনে নেই, নিশ্চয়ই করেছিলেন, নাহলে আমি খুঁজে পেলাম কী করে ? বেশ খানিকটা চড়াই ভেঙে উঠতে হয়। মিনিট পনেরো এভাবে চলে আমি গিয়ে পৌঁছোলাম।

মিমবেলার সঙ্গে আলাপ হল। উনি ভালোই ইংরেজী বলেন, ওঁর রুম থেকে কয়েকটি রুম পরেই আমার রুম। এখানে আবার সেই ১৭ – আমার রুম নাম্বার হল ১৭। আমার রুমে আরও একজন – মিমবেলার কাছেই পি এইচ ডি করছে – আরোলদো পেরেজ পেরেজ। ও-ও ভাঙা ভাঙা ইংরেজী বলতে পারে। রুমে একটিই কম্পিউটার। দুজনে শেয়ার করতে পারে। আমি গিয়েই আমার রিডিফমেল চেক করলাম। লোপাকে সঙ্গে সঙ্গে মেলও লিখে ফেললাম। জানা গেল আমি সিমাতেরও একটি ইমেল অ্যাকাউন্ট পাবো। আর দেখলাম ক্রিকইনফো ওয়েবসাইট-এ যেসব খেলা চলছিল, সেগুলোর স্কোরও চটপট পেয়ে গেলাম। তবে কম্পিউটারে বেশীক্ষণ বসলাম না। যেজন্য এসেছি, তাতে একাগ্র হতে হবে। মিমবেলা বোধহয় বলেছিলেন বিকেলে এসে প্রবলেমটা দিয়ে যাবেন। তবে পড়াশুনো বেশী হল না, কী সব ফর্মালিটি পুরো করবার জন্য অনেক ফর্ম-টর্ম ফিল আপ করলাম। লাইব্রেরিতে কার্ডও বোধহয় করলাম আর বইও নিলাম। এসব করতে করতে একটা বেজে গেল। আমি ভাবলাম – লাঞ্চে যাবো, মিমবেলাকে বলে যাই। উনি শুনে বললেন – এখানে লোকে দুটো-তিনটেয় লাঞ্চ করে। অগত্যা আবার বসে থাকা।

লাঞ্চের সময় আলাপ হল আংখেলের সাথে। ইংরেজীটা খারাপ বলেন না। আংখেল আমাকে বললেন কমেরসিয়াল মেখিকানার কথা অর্থাৎ কিনা কমার্শিয়াল মেক্সিকানা। আমি ভাবলাম গিয়ে কিছু খাবারদাবার কিনবো – হয়তো কিছু স্ন্যাক্স আর কলা। মিমবেলা বলেছিলেন এখানে বৃষ্টি হয় – তাই একটা ছাতা কিনতে হবে। খাওয়াদাওয়াটা ভালোই হল – বেশ

এলাহী ব্যাপার – স্টার্টার থেকে শুরু করে ডেসার্ট পর্যন্ত। আর মাত্র তেত্রিশ পেসো পার লাঞ্চ – সব মিলিয়ে। বুঝেশুনে খাবার চেষ্টা করলাম। অবশ্যই ভাষার সমস্যা ছিল, তবু ম্যানেজ হল।

লাঞ্চের পর মিমবেলা এসে প্রেজেন্ট করলেন, একটা পেপারও পড়তে দিলেন। আর বললেন – শিগগিরই উনি এক মাসের জন্য ইউরোপ যাচ্ছেন। ফিরে আসার পর আমাদের ফরম্যালি কাজ শুরু হবে। ততদিন আমি নিজের মতো পড়তে পারি। আমিও ভাবলাম – ভালোই হল। এই সুযোগে পুরোনো পড়া একটু ঝালিয়ে নেয়া যাবে। নোটস তৈরী করলে কেমন হয়? যেসব বই নিয়েছি লাইব্রেরী থেকে সেগুলো দিয়ে শুরু করে পরে না হয় আবার বই নেয়া যাবে। যথাসময়ে পাঁচটা বাজল। আমিও তৈরী হলাম কমেরসিয়েল মেখিকানা যাবার জন্য। খুব সম্ভবতঃ প্রথম গেলাম সিমাতেল, গিয়ে নিজের বইপত্র রেখে তারপর টাকাপয়সা নিয়ে রওনা হলাম যাওয়ার জন্য। আংখেল বলেছিলেন – সিমাতেল থেকেই বাস ছাড়ে। বাসকে বলা হয় – আউতোবুস। সেই আউতোবুসে কমেরসিয়াল মেখিকানায় পৌঁছোতে বোধহয় মিনিট পনেরো লেগেছিল। কমেরসিয়াল মেখিকানা হল ওয়ালমার্টের মেক্সিকান ভার্সন। ছাতা, খাতা, কলা, বিস্কুট এসবই কিনেছিলাম। রাতে বোধহয় ডিনারের বন্দোবস্ত ছিল না। তাই এসব খেয়েই রাত কাটাতে হবে। ফেরবার সময় হাতে জিনিস থাকায় ট্যাক্সি নিলাম। ট্যাক্সি যখন আমাকে ইগলেসিয়া দে ভ্যালেন্সিয়ানায় (এ হল সিমাতেলের কাছের সেই চার্চ যার ঘন্টাধ্বনিতে আমার সকালে ঘুম ভেঙেছিল) নামিয়ে দিল, আমি ঠিকঠাক জিজ্ঞেস করতে পেরেছিলাম, "কুয়ানতো ?" মানে "কত ?" আর ট্যাক্সিড্রাইভার যখন বলেছিল "ভেইনতিসিংকো", তখন আমার বুঝতে এক মুহূর্তও দেরী হয় নি যে ওটা "পঁচিশ"। সিমাতেলে এসে ফ্রেশ হয়ে খাওয়াদাওয়া করে নিলাম – আমার ডিনার! শেষ হয়ে গেল আমার সিমাতের প্রথম দিন।

।।৩।।

মিমবেলা চলে গেলেন ইউরোপ। আমি নিজেই এবার আমার সময়ের মালিক। ঠিক করে ফেললাম উনি ফেরবার আগে এই এক মাস ভালো করে কাজে লাগাতে হবে। উনি যে বইটি আমি ইন্ডিয়া থাকার সময়েই আমাকে পড়া শুরু করতে বলেছিলেন, সেটি আমি ইন্ডিয়া থেকেই জেরক্স করিয়ে নিয়ে এসেছিলাম, সেটি দিনের বেলা সিমাতে এসে ফ্রেশ ব্রেনে পড়তাম কারণ নতুন জিনিস! এরপর লাঞ্চের পর থেকে পুরোনো পড়া। বিকেলে সিমাতেলে ফিরে চান-টান করে তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে পারলে আরও। কমেরসিয়েল মেখিকানা থেকে নোটস লেখার কিছু খাতা কিনে এনেছিলাম আর একটি অ্যালার্ম ক্লক-ও। অনেক অনেক বই নিলাম লাইব্রেরী থেকে। কষে নোটস লেখা শুরু হল। উইকডেগুলো এভাবে নোটস লিখতাম আর মাঝে মাঝে নিজেকে এন্টারটেইন করবার জন্য ক্রিকেটের কাল্পনিক খেলার স্কোর বানাতাম। নোটস লেখা, স্কোর বানানো ছাড়া আর বাকী রইল খাওয়াদাওয়া। খাওয়াদাওয়ার কথা আগে যা বলেছি – সিমাতেলে ব্রেকফাস্ট-লাঞ্চ আর নিজের রুমে নিজের ব্যবস্থাপনায় ডিনার। আর উইকেন্ডে লাঞ্চের জন্য কোনো না কোনো রেস্টুরেন্টে বোধহয় যেতাম, একইসঙ্গে আশেপাশে কোনো না কোনো সাইবার ক্যাফেতে ঢুকে একটু-আধটু নেট সার্ফিং। এইভাবে চলতে চলতে দিন পঁচিশেক সিমাতেলে কাটানোর পর আমি একটি অ্যাপার্টমেন্টের খোঁজ পেয়ে গেলাম।

আংখেলই আনলেন অ্যাপার্টমেন্টের খবর। সিমাতেল থেকে বাসে বোধহয় দু স্টপ। এর আগে গোটা দুই তিন বাড়ী দেখবার পর এই বাড়ীখানা আমার পছন্দ হল। এই বাড়ীতে লোপা আসবে, আমার ভাবী সন্তান আসবে, বাড়ীখানা মনমতো হওয়া চাই বৈকি! পুরোপুরি ফার্নিশড বাড়ী, বাড়ীটিতে দুটিই রুম – একটি লিভিং রুম ও একটি বেডরুম – তবে দুখানা রুমই বেশ বড় বড়। এ ছাড়া কিচেন, কিচেন এবং লিভিং রুমের মধ্যে পার্টিশন একখানা উঁচু টেবল মতো, যার ধারে চেয়ার রেখে অনায়াসে এই পার্টিশনকে ডাইনিং টেবল বানিয়ে বসে খাওয়া যায়। ভাগ্য ভালো, আমি উইকেন্ডে শিফট করলাম – খুব সম্ভবতঃ শনিবার – আর তাই রাত্রে শোবার আগেই গিয়ে বিছানা রেডি করবার উপযুক্ত জিনিস কিনে আনার প্ল্যান হল।

কমেরসিয়েল মেখিকানা থেকে বেরিয়ে একটু সামনে এগিয়ে বাঁদিকে ঘুরলে লম্বা টানা রাস্তা রয়েছে, সেখানে হরেক রকমের দোকান। সেখানেই সম্ভবতঃ দেলসোল চোখে পড়ল। পরে জেনেছিলাম – এটি মেক্সিকোর অন্যতম চেন স্টোর।

এখান থেকেই কিনলাম বিছানার চাদর, বালিশ, তোশক, বেডকভার। তা ছাড়া কমেরসিয়েল মেখিকানা থেকে নিজে বাড়ীতে রান্নাবান্না করবার জন্য কিছু খাবারদাবার। প্রথম রাত্রে রেঁধেছিলাম কি কিছু? বোধহয় না, কারণ উইকেন্ড হয়ে যাওয়ায় বোধহয় গ্যাস সিলিন্ডার ছিল না। খুব সম্ভবতঃ উইকডের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তবে বিছানা ঠিকঠাক পেতে নিয়েছিলাম এবং লোপার জন্যও জায়গা করে রেখেছিলাম আমার পাশটিতে। আর তো মাত্র কয়েকটি মাস। ডিসেম্বর হয়ে গেলে ক্রিস্টমাসের ছুটি পড়লেই গিয়ে ওকে নিয়ে আসবো। বড় জোর আর ছ মাস! ছ মাস ঠিকঠাক কেটে যাক, আমি নিজের কাজে ঠিকমতো এগোই, আমাদের বাচ্চাটার ঠিকঠাক জন্ম হয়ে যাক! সব ভালোয় ভালোয় মিটলে লোপার এ বাড়ীতে এসে যাওয়া শুধু সময়ের প্রতীক্ষা। এখানে এসিও নেই, আর গরম তেমন নেই বলে ফ্যানও দরকার নেই। তাই এসব ছাড়াই দিব্যি চলতে লাগল। এবারে রান্নাবান্নার কথা একটু বলি। সেই রান্নাবান্না, যা আমি এতদিন শুধু লোকজনকে করতেই দেখেছি, নিজে কোনোদিনও করি নি।

ইন্ডিয়ার মতো এখানেও গ্যাস সিস্টেম, তাই এখানেও সিলিন্ডারের ওপর নির্ভর করা। আমার বাড়ীওয়ালা লুই পাবলো কাস্ত্রো বললেন যে দুটো গ্যাসের কোম্পানি রয়েছে, তারা গাড়ী নিয়ে যায় বোধহয় সোম, বুধ, আর শুক্রবার। গ্যাস ফুরিয়ে গেলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওদের ডেকে আনতে হয়। তারা নতুন সিলিন্ডার লাগিয়ে দিয়ে পুরোনো সিলিন্ডার নিয়ে চলে যায়। এ ছাড়া আবর্জনার গাড়ীর কথাও বললেন। মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার, আর শনিবার অর্থাৎ ওঁর ভাষায় 'টিউসডে', 'থুরসডে' আর 'স্যাটুরডে' – এই তিনদিন গাড়ী আসবে। যেহেতু উইকডেতে আমি থাকবো সিমাতে, তাই শনিবারই আমার ভরসা। মিঃ কাস্ত্রোর কথামতো আমি পরের শনিবার ময়লার ব্যাগ রেডি করে অপেক্ষা করেছিলাম। তারপর গাড়ী যখন এল, আমি ছুটে গিয়েছিলাম সেই ব্যাগ নিয়ে। কী বলবো, বুঝতে পারি নি। ড্রাইভারটি জিজ্ঞেস করল, "বাসুরা ?" আমি বুঝলাম ময়লার কথাই বলা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ময়লার ব্যাগ ওকে ধরিয়ে দিলাম। বুঝতে পারার আরও একটা কারণ হল আগের বছর মুম্বাইতে থেকে জেনেছিলাম সেখানে ময়লাকে বলে 'কাচরা'। 'কাচরা' আর 'বাসুরা' এই দুটো শব্দের মধ্যে মিলও আমাকে বুঝতে সাহায্য করেছিল। আগের বছর মুম্বাই আর এ বছর মেক্সিকো – দু জায়গায় থাকার মধ্য দিয়ে আমার ভকাবুলারিতে অনেক শব্দ যোগ হয়ে গেল।

খুব সম্ভবতঃ সোমবারই আমার জুটে গিয়েছিল গ্যাস সিলিন্ডার। 'গ্যাস বুতানো' কোম্পানির গ্যাস সিলিন্ডার আমি নিয়েছিলাম। প্রথমদিন আমি খিচুড়ি আর ফুলকপি বানাবার চেষ্টা করেছিলাম। এখানে তো আর মুসুর ডাল নেই, তাই যে লেন্টিল পাওয়া যায়, তাই দিয়ে এই খিচুড়ি। লেন্টিল অবশ্যই ভিজিয়ে রাখলে ভালো হত, কিন্তু আমি জানতাম না, আর মাথায়ও খেলে নি, তাই একটু শক্ত শক্ত খিচুড়িই খেলাম। এখানে হলুদও পাওয়া যায় না, তাই কমলা রঙের একটি মশলা দিয়ে কাজ চালানোর চেষ্টা করলাম। ফুলকপি কিনেছিলাম বানাবো বলে, কিন্তু গ্যাসের চুলোকে কী করে কমাতে বাড়াতে হয়, বুঝলাম না। ইন্ডিয়াতে গ্যাসের চুলোয় দেখেছিলাম – মাঝখানে মানে ম্যাক্সিমাম, একধারে নিলে অফ আর অন্যধারে নিলে সীম, কিন্তু সীম করবার কোনো উপায়ই এখানে বুঝলাম না। দুই এক্সট্রিমের মাঝখানে পড়ে আমার যে অবস্থা হল, তাতে আধা সেদ্ধ অথচ পোড়া ফুলকপিই খেতে হল। এরপর থেকে আমি ঠিক করলাম, ফুলকপিকে কুকারে বানিয়ে নেবো। তাই যেদিন কুকারে খিচুড়ি হবে, সেদিন ফুলকপি না বানিয়ে অন্য কোনো সবজি বানাতে হবে। আর কী কী সবজি বানাতাম, ঠিক মনে পড়ছে না। চাল আর ব্ল্যাক বীনস দিয়েও খিচুড়ি বানাতাম – মনে আছে। ব্ল্যাক বীনস যে ভিজিয়ে রাখার ব্যাপার আছে, সেটা জানাও ছিল না, চেষ্টাও করি নি। তবু দু-তিনটি সিটিতে যে 'খিচুড়ি'টি হত, সেটি সম্পূর্ণ ভুল একটি প্রিপারেশন হলেও খেতে খারাপ লাগত না। তাই কুকারকে নিয়মিত ব্যবহার করে বাড়ীতে রাত্তিরে রান্নাবান্নার পাট শেষ অব্দি বজায় রাখতে পেরেছিলাম।

রান্না করবার সময় যদি কোনো কারণে কখনো সখনো মিঃ কাস্ত্রো চলে আসতেন আর কুকারে সিটি উঠত, তখন ভয়ে ভদ্রলোক দু কানে আঙ্গুল দিতেন। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম এই সিটি কী এমন যে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষকে ভয় পাইয়ে দিত! একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করলাম। ভদ্রলোক না পারলেও প্রচন্ডভাবে চেষ্টা করেন আমার সাথে ইংরেজী বলবার।

আর যখনই শব্দ খুঁজে পান না, তখনই চারদিকে তুড়ি মেরে মেরে মনে করবার চেষ্টা করে যেতে থাকেন। যেন বাতাস থেকে শব্দ পেড়ে আনছেন! তখন হাসিও পেত, কষ্টও হত! পরে জেনেছিলাম – এখানে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত ইংরেজী পড়লেই হয়, তারপর আর দরকার নেই। সেজন্যই রাস্তায়-ঘাটে, দোকানে-বাজারে মানুষের সঙ্গে কথা বলা এতো কষ্টকর। ভদ্রলোকের দুটি কুকুর ছিল – একটি সামনে আর একটি পেছনে থাকত, সামনে থেকে পেছনে যাওয়ার কোনো সোজাসুজি উপায় ছিল না। তবু ওরা দুজনে কম্যুনিকেট করত। যেমন ধরা যাক, 'গ্যাস এক্সপ্রেস' যখন আসত লোকজনকে গ্যাস দিতে! তারা বড় বড় হর্ন দিত আর মাইকে লোককে ডাকত গ্যাস নেয়ার জন্যে। সেই হর্ন আর সেই ডাক শুনে পেছনের কুকুরটি কেঁদে উঠত আর সেই কান্না শুনে সামনের কুকুরটিও!

আস্তে আস্তে আমার এই অ্যাপার্টমেন্টের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে লাগলাম। মিমবেলার ফেরার দিন এগিয়ে আসতে লাগল। অ্যাপার্টমেন্টে এসেও আমার পড়াশুনোর রুটিন মোটামুটি একইরকম চলছিল। সকালবেলা চটপট চান করে তৈরী হয়ে সিমাতেল গিয়ে ব্রেকফাস্ট করা, সেখান থেকে হেঁটে সিমাত যাওয়া, সেখানে বসে পড়াশুনো করা, নোটস বানানো, লাঞ্চের সময় আবার সিমাতেল এসে খাওয়াদাওয়া করা, আবার সিমাতে ফিরে এসে কাজকর্ম করা, দরকার হলে লাইব্রেরী থেকে আরও আরও বই নেয়া, তারপর বিকেল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা বাজলে বাসে করে বাড়ী এসে ফল-টল খাওয়া, আবার চান করা, তারপর ফ্রেশ হয়ে রান্নাবান্নার জোগাড়যন্ত্র করা। রান্নাবান্না বলতে ওই ভুল পদগুলো দিনের পর দিন ধরে রান্না করে যাওয়া। হাজার হোক এই ভুল খাবারগুলো সারা রাতের মতো আমার খিদে তো মিটিয়ে দিত! আর এই ভুল খাবারগুলো আমাকে অতগুলো মাস মোটামুটি সুস্থ শরীরে বাঁচিয়ে তো রেখেছিল! হ্যাঁ, পরে যখন এক সময় ইন্ডিয়া যাওয়ার সুযোগ এসেছিল, তখন আমার ওজন বেড়ে গিয়েছিল, রক্তে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গিয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সে যত না আমার বাড়ীর খাবার খেয়ে, তার থেকেও বেশী সিমাতেলের খাবার খেয়ে। যতই ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ সিমাতেলে করি না কেন, রাতের খাওয়াদাওয়াটা বাড়ীতেই হত। খাওয়াদাওয়ার পাট চুকলে পর রান্নাঘর সাফ করে আমি বসে যেতাম নোটস বানাতে।

প্রায় চার-পাঁচ সপ্তাহ ধরে নোটস বানিয়ে বানিয়ে আমার এন্টারটেইনমেন্ট বলতে কিছুই ছিল না। সিমাতে একটুখানি ইন্টারনেট দেখা আর ক্রিকেটের স্কোরগুলো জানা আর উইকেন্ডে, বিশেষ করে রোব্বারদিন, কমেরসিয়েল মেক্সিকানা গেলে বাজার করবার আগে কোনো সাইবারক্যাফেতে ঢুকে কিছুক্ষণ একটু নেট সার্ফিং করা, লোপাকে ইমেল লেখা, মাকে ইমেল লেখা। মনে হচ্ছিল, আরেকটু কিছু করা দরকার যাতে মনটা কিছুক্ষণের জন্য হলেও একটুখানি পাখা মেলে ওড়বার সুযোগ পায়! এরপর কোনো এক রবিবার সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে আমি কুমার শানুর একটি ইয়াহু গ্রুপ আবিষ্কার করলাম এবং তাতে মেম্বার হলাম।

ইতিমধ্যে মিমবেলা ফিরে এলেন। ওঁর সঙ্গে প্রবলেম নিয়ে ডিসকাশন শুরু হল। তাই করতে গিয়ে বেশ কিছু বই, বেশ কিছু পেপার জেরক্স করাতে হল। এবারে পুরোনো পড়ার নোটস বানানোর পরিবর্তে এই নতুন বই ও পেপার থেকে নোটস বানানো শুরু হল, সঙ্গে সঙ্গে প্রবলেমটা নিয়ে চিন্তাভাবনা। জিনিসটা যেহেতু আমার কাছে নতুন, আমি কী ভাবে এগোবো, তা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। মিমবেলার কাছে গেলে উনি একটুখানি ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন। এই ছিল আমার জন্য যথেষ্ট। এরপরের দুদিনে আমি পুরোটা ইন্ডাকশন দিয়ে প্রমাণ করে ফেললাম। মন ভরে উঠল আত্মপ্রসাদে। পেপারের আদ্ধেকটা কাজ তো মনে হল হয়েই গেল। এবারে বাকী পার্টটুকু নিয়ে কিছু করতে পারলে আর দেখতে হবে না! একটা পেপার অনায়াসে হয়ে যাবে।

কিন্তু একদিন গেল, দুদিন গেল, ঠিক যেন বুঝলাম না কীভাবে হতে পারে জিনিষটা। নানা রকম পেপার জেরক্স করলাম, লাইব্রেরী থেকে আরও বই নিলাম। নিজেও লিখে গেলাম পাতার পর পাতা, কিছুতেই যেন কিছু হয় না। মিমবেলার কাছে গেলেও ঠিক কোনো আইডিয়া পাওয়া যায় না। উনিও শুধু এই বই, সেই বই বলেন। একবার উনি আমাকে একখানা বই দিলেন পড়তে - ওঁর নিজেরই বই। তারপর বললেন - পড়া হয়ে গেলে নীচে ওঁর মেলবক্সে রেখে

দিতে। মজার ব্যাপার হল – ওঁর রুম আমার রুম থেকে মাত্র কয়েকটি রুম পরে। চাইলেই উনি রুমে থাকলে ওঁর রুমে গিয়ে এটি দিয়ে আসা যায়। কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। সেখানে অতগুলো সিঁড়ি ঠেঙিয়ে নীচের মেলবক্সে রাখতে যাওয়া সত্যিই বেশ ঝকমারি। হ্যাঁ, এক্সারসাইজের জন্য ঠিক আছে। আমাদের এই গুয়ানাখুয়াতো শহর এক পাহাড়ী শহর, এখানে এই সিমাত বিল্ডিং থেকে অনেক ভাবেই বেরুনো যায় – সবচেয়ে উঁচু এবং সবচেয়ে নীচু ফ্লোর – দু দিক দিয়েই রাস্তায় পড়বার উপায় রয়েছে। সেসব কারণেই বোধহয় এই বিল্ডিঙে কোনো লিফট বা এলিভেটর নেই। তাই সবচেয়ে উঁচু ফ্লোর থেকে সবচেয়ে নীচু ফ্লোরে নামা অবশ্যই সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তা সত্ত্বেও মিমবেলো যখন বলছেন, তখন বোঝা যায় উনি চান না ওঁর রুমে যখন তখন যাই।

এদিকে লোপাকে নিয়েও আমার ভাবনা বেড়ে গেল। আগে লিখেছিলাম লোপাকে আমি সপ্তাহে দুবার ফোন করলেও ইমেল অন্ততঃ প্রায় রোজই লেখার চেষ্টা করতাম, ও-ও করত। ও সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর দিলে ভালো লাগত, কিন্তু ভয়ও হত। ভালো লাগত কারণ এই দূরদেশে যেখানে সামান্য বাংলা বা হিন্দী বলবার সুযোগ নেই, একজন ভারতীয়ও নেই আশেপাশে, তখন এই মেসেজগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। একদিন একটা ইমেলে আমি লিখেছিলাম যে আমি প্রচন্ড আশ্চর্যের সঙ্গে একটি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট আবিষ্কার করেছি, যেখানে সিমাতেলে দুপুর দুটোয় লাঞ্চ করা সত্ত্বেও আবার বিকেল ছটায় একটা কমপ্লিট ভারতীয় মীল খেতে আমার একটুও আটকায় নি। হোক না স্টাফরা মেক্সিকান, খাবারটা তো ভারতীয়, স্বাদটা তো ভারতীয়! লোপাকে পরদিনই আমি সকাল সকাল মেল করে লিখলাম এর কথা। লোপা বলল ওর চোখে জল এসে গেছে শুনে। আমি যেন এরপর যখন ইচ্ছে হয়, তখনই গিয়ে ওখানে খেয়ে আসি। এ ধরনের ইমেলগুলো আমার জন্য সত্যিই অনেক মূল্যবান। কিন্তু তার থেকেও বেশী মূল্যবান লোপার ঠিক থাকা। তাই ভয় হত। ভয় হত কারণ লোপার বাবা-মার বাড়ী শিলচরে অম্বিকাপট্টিতে এক টিলার ওপর যার নাম কলেজ টিলা। আমাকে ইমেল লিখতে হলে ওকে সেই টিলা ভেঙে ওঠানামা করতে হয়। এদিকে অগাস্ট পড়ে গেছে। আমাদের সন্তানের জন্মের দিন এগিয়ে আসছে। এসব ইমেল লেখার বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে শেষে কোনো অনর্থ না বাধে।

শেষ পর্যন্ত যা ভয় করছিলাম তাই হল। ডাক্তার লোপাকে কমপ্লিট বেডরেস্টের অ্যাডভাইস দিলেন। এমনিতে আমি লোপাকে নিয়ে অত চিন্তা করছিলাম না। ভাবছিলাম বাবা-মার কাছে আছে, ভালোই থাকবে। কিন্তু বেডরেস্টের পর সত্যিই ভয় ঢুকে গেল। লোপা ঠিক থাকবে তো? বাচ্চাটার ঠিকঠাক ডেলিভারি হবে তো? ডেলিভারির পর লোপা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে তো? ছেলের জন্মের আগের দিন সিমাতে কী সব উৎসব ছিল, খাওয়াদাওয়া ছিল। আমি কোনো রকমে একটু খেয়েছিলাম। লোকজনের আনন্দ উৎসবের মধ্যে আমার এদিকে চিন্তা!

শেষ পর্যন্ত কোনো অসুবিধে ছাড়াই লোপার ঠিকঠাক ডেলিভারি হয়ে গেল – আমাদের সবার সৌভাগ্য। ভালোয় ভালোয় মিটল, এ-ই ঠাকুরের অশেষ কৃপা। স্বদীপ্তর দু মাস বয়সের ফটো লোপা আমাকে পাঠিয়েছিল। যেন ঠিক ছোটোবেলার আমি! দেখে মনে হল – এই শিশুটি তার বাবা থেকে কত দূরে নিজের দাদু-দিদার আশ্রয়ে থেকে মানুষ হচ্ছে! জানেও না যে সে তার বাবাকে জন্মের সময় দেখে নি। এও জানে না কবে সে তার বাবাকে দেখবে। ভাবতে ভাবতে অসহায় শিশুটির জন্য বুকে কেমন করে উঠত।

।। ৪ ।।

স্বদীপ্তর জন্ম হয়ে গেল, আমার মনের দুশ্চিন্তাও দূর হল, কিন্তু আমার সেই সমস্যা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই থেকে গেল। প্রবলেমের বাকীটা আর যেন কোনোমতেই সল্ভ হতে চায় না। আমিও আরও বেশী বেশী করে জড়িয়ে পড়ি কুমার শানু গ্রুপে। অনেক অনেক সময় আমার গ্রুপে কেটে যেতে লাগল। শুধুমাত্র প্রবলেমটা না পারবার জন্যই যে পড়াশুনো থেকে মন উঠে গিয়েছিল, তা নয়। আরও একটা কারণ ছিল। বড় আশা করেছিলাম – লোপাদেরকে ডিসেম্বরে আমার কাছে নিয়ে আসবো। কিন্তু আসতে হলে লালার পাসপোর্ট চাই, পাসপোর্ট করাতে হলে বার্থ সার্টিফিকেট চাই। সেই

বার্থ সার্টিফিকেট-ই হয়ে উঠছিল না। আমার শ্বশুরমশাই এতো চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু শিলচর মিউনিসিপ্যালিটি ওঁকে ঘোরাতে ছাড়ে নি। এসবের জন্য ধীরে ধীরে বুঝতে পেরে গেলাম যে লোপাদেরকে এখানে ডিসেম্বরে আনবার স্বপ্ন আমার অপূর্ণই থেকে যাবে। এ-কারণেও মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পড়াশুনো করতে পারি নি।

ইতিমধ্যে একটি মজার ঘটনা ঘটেছে। অক্টোবর মাসের শেষ সোমবার ছিল সেটি। সাধারণতঃ আমি আর আরোলদো একসঙ্গে খেতে যাই। কিন্তু উইকেন্ড ছিল বলে ও কোথাও গিয়েছিল, সোমবারেও ফেরে নি। আমি রুমে একা, লাঞ্চের সময় অর্থাৎ দুটো বাজলে, আমি একাই সিমাতেলে গেলাম লাঞ্চ খেতে। যখন গিয়ে পৌঁছোলাম – দেখলাম কেউই নেই ক্যাফেটেরিয়ায়। কেউই খাচ্ছে না বসে। আমি কি থাকবো না যাবো ? কিন্তু এতটা রাস্তা হেঁটে এসেছি, বরং দেখাই যাক না! সবাই আমাকে অবাক হয়ে দেখল। হেড কুকও অবাক ভাব মুখে নিয়েই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কী খাবো, আমি বললাম। খাবার অবশ্য তৈরী ছিল। আমি খেয়ে নিলাম চটপট, এরপর আবার সিমাতে ফিরেও গেলাম। পরদিন মঙ্গলবার। আরোলদো ফিরে এসেছে। দুটো বাজবার পাঁচ মিনিট আগে আমি ওকে বললাম খেতে যাবে নাকি। ও একবার ঘড়ি দেখল, আমাকেও দেখাল, দেখলাম একটা বাজতে পাঁচ। ও বলল আরও ঘন্টা খানেক বাদে যাবে, এখন তো সবে একটা। আমি অবাক হয়ে আমার ঘড়ি দেখলাম। তখন ও আমাকে প্রথম বলল, কী ভাবে অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে আমেরিকা-মেক্সিকোসহ পৃথিবীর বেশ কিছু সংখ্যক দেশে সময় এক ঘন্টা পিছিয়ে যায়। পরে জানলাম সেটি হয় অক্টোবরের শেষ রবিবারে। সত্যিই আশ্চর্য্য হলাম, আমাদের এতো আমেরিকান কানেকশন, কিন্তু এই ব্যাপারটা আমাকে কেউ বলে নি? আমি জানিই না? সত্যিই খুবই অদ্ভুত ব্যাপার, সন্দেহ নেই! আরও কত কিছু জানবো কে জানে? জানলাম, সময় আবার মার্চের শেষ সপ্তাহে এগোবে।

অনেকদিন ধরেই আমার পড়ানোর শখ। মিমবেলাকে বললামও সে কথা। জিজ্ঞেসও করে ফেললাম স্প্রিং সেমেস্টারে পড়াবো নাকি। পড়াতে হলে তো স্প্যানিশ জানতে হয়! কোথায় শিখবো স্প্যানিশ? তাহিল ভামবোয়ানীর কাছে চারদিনের লেসনে তো বিশেষ লাভ হয় নি! এরপর খবর নিয়ে জানা গেল ইউনিভার্সিটি অফ গুয়ানাখুয়াতোতে এক মাসের ক্র্যাশ কোর্স করা যেতে পারে। ভর্তি হলাম সেই কোর্সে। রীডিং, গ্রামার আর স্পিকিং – তিনটে পিরিয়ড ছিল। স্প্যানিশ শিখতে গিয়ে জানলাম – স্প্যানিশেও হিন্দীর মতো লিঙ্গ বিশেষে সর্বনাম আর ক্রিয়ার রূপ বদলে যায়। আর শুধু পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গতেই নয়, ক্লীবলিঙ্গতেও হিন্দীর মতো পুরুষ-স্ত্রী ভেদ রয়েছে। আরেকটা মিল হল – যেমন বানান তেমনি উচ্চারণ। গ্রামার ক্লাসে জানলাম স্প্যানিশে বারো রকমের টেন্স। সব মিলিয়ে বেশ কষ্টকর ব্যাপার। তবু ভালোই উৎকর্ষ দেখাতে পেরেছিলাম মনে হয়। কারণ পরে যখন রেজাল্ট বেরিয়েছিল, আমি রীডিং-এ এ-মাইনাস আর বাকী দুটিতে এ-প্লাস পেয়েছিলাম।

আমার ইন্ডিয়া যাওয়া অনিশ্চিত হয়ে যাওয়াতে মাঝে মাঝে কোনো কোনো দুর্বল মুহূর্তে মনে হত – আদৌ আর যেতে পারবো তো? এই এখানকার মেক্সিকোর জগৎ তো সম্পূর্ণ অন্য জগৎ। কাউকে যদি বলা হয় এখানেই সারা জীবন থেকে যেতে, তো সে কীভাবে নিজের পূর্ব জীবনের সব কিছুকে ভুলে নিজেকে এই জগতের সঙ্গে মানিয়ে নেবে? কীভাবে এখানকার ভাষা, সংস্কৃতি, উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সব কিছুকে জীবনের মতো আপন করে নেবে? আমাকে যদি কেউ তা করতে বলে, আমি কি পারবো? ভাবতে ভাবতে মন আরও খারাপ হয়ে যেত। মাঝে মাঝে কোনো মেক্সিকান ছেলে বা মেয়ের মধ্যে আমি আমার ভারতের ছেলে বা মেয়েকে যেন খুঁজবার চেষ্টা করতাম। সত্যি, কাউকে কাউকে দেখলে মনে হত – ঠিক যেন ভারতীয়, ভাষাটাই শুধু স্প্যানিশ!

অবশেষে বহুবার শ্বশুরমশাইকে ঘোরানোর পর বোধ করি নভেম্বর নাগাদ মিউনিসিপ্যালিটি করে দিয়েছিল বার্থ সার্টিফিকেট। এরপর পাসপোর্টের জন্য বাবা হিসেবে আমারও ভূমিকা ছিল। এর জন্য নিকটতম ভারতীয় এমব্যাসিতে যাওয়ার দরকার ছিল। নিকটতম ভারতীয় এমব্যাসি বলতে মেক্সিকো সিটি। আগের দিন গুয়ানাখুয়াতো থেকে বাসে চেপে সেখানে পৌঁছে আই এস আই-তে আমার এক বছর সিনিয়র শ্যামল কুমারের বাড়ীতে উঠলাম এবং পরদিন গেলাম এমব্যাসি – কাজকর্ম মিটিয়ে লাঞ্চ সেরে শ্যামলকে টা-টা বলে আমি আবার ফেরার বাসে চড়ে বসলাম – মেক্সিকো সিটি থেকে গুয়ানাখুয়াতো।

গোবিন্দন ছিল আমি ছাড়া সিমাতের একমাত্র ভারতীয়। গোটা গুয়ানাখুয়াতোতে এ ছাড়া আর কোনো ভারতীয় আমার চোখে পড়ে নি। গোবিন্দন ফ্যাকাল্টি হিসেবে জয়েন করেছিল আমি জয়েন করবার দু মাসের মধ্যে। মাঝে মাঝে আমি আর ও একসঙ্গে লাঞ্চ খেতে যেতাম। ও বেশী খেতে পারত না। আমি বেশীর ভাগ দিনই পারতাম। স্টার্টার, স্যুপ, এন্ট্রি, ডেসার্ট – সব মিলিয়ে কোনো কোনো দিন সত্যিই আমার বেশী মনে হত। গোবিন্দন আমাকে বলেছিল, "ইউ ইট আ লট, ম্যান"। একবার খুবই আশ্চর্জনক একটি ঘটনা ঘটেছিল। ভারতীয় ওড়িশি নাচের এক প্রোগ্রাম হয়েছিল এই খোদ গুয়ানাখুয়াতোতে! গোবিন্দন আর আমি দুজনেই দেখতে গিয়েছিলাম। এক মেক্সিকান মেয়ে ভারতীয় সাজে সেজে, শাড়ী পরে, কপালে টিপ পরে এসে স্প্যানিশে অনুষ্ঠান সংযোজনা করেছিল! দেখে বেশ লেগেছিল। শুরুর দিকে নিয়মিত যোগাযোগ থাকলেও গোবিন্দনের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে সময় লেগেছিল। শুরুতেই ও বলেছিল ওর মুম্বাই আই আই টি-তে পি এইচ ডি হওয়ার কথা – ওর সাবজেক্ট স্টোকাস্টিক ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। তবে শানু গ্রুপই তখন আমার জন্য অনেক ছিল, ওর রুমে অত যেতামও না আমি। কিন্তু এরপর যখন এক অনিশ্চয়তা এল, যখন মনে হল মিমবেলার দেয়া প্রবলেমটা সলভ্ করে উঠতে না পারায় এক্সটেনশন নাও হতে পারে, তখন কাজকর্ম করা, গ্রুপে পার্টিসিপেট করা, ক্রিকেট নিয়ে পড়া, ভাবা, লেখা, এসব সত্ত্বেও মনে হল আরও কিছু চাই! তখনই আমি ফাঁক বুঝে চলে যেতে লাগলাম গোবিন্দনের রুমে। ও আমাকে বেশ এন্টারটেইন করত। ও ছিল কিশোরের ফ্যান, কিশোরের ভালো লাগা গানের কথা বলত, মাঝে মাঝে রাগা ডট কম ওয়েবসাইটে কিশোর কুমারের গানও বাজাত। একদিন তো উইকেন্ডে আমাকে ওর বাড়ীতেই নেমন্তন্ন করে ফেলল। আমি ওর বাড়ীর টিভিতে অমিতাভ বচ্চন অভিনীত 'মিঃ নটবরলাল' ছবিটি দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম।

।। ৫ ।।

শেষ পর্যন্ত যা ভয় করেছিলাম, তাই হল, আমার এক্সটেনশন হল না। আমি সিমাতের ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বললাম। উনি আমাকে মেক্সিকোর দক্ষিণে কানকুনের কাছাকাছি একটি জায়গার কথা বললেন। শহরের নাম মেরিদা – রাজ্যের নাম ইউকাতান পেনিনসুলা। ইউনিভার্সিটির নাম উয়াদী – ইউনিভার্সিদাদ আউতোনোমা দে ইউকাতান। সেখানে আমাকে সিমাতের ডিরেক্টর রেকমেন্ড করে দিলেন। উয়াদীতে আমার চাকরি হয়ে গেল, অগাস্টে জয়েন করতে হবে! এই প্রথম আমি পড়াবো! উয়াদীর চাকরির সঙ্গে সঙ্গে আমি ঠিক করে ফেললাম ইন্ডিয়া যাবো। এখানকার আমারই বয়সী ফ্যাকাল্টি, এফরেন মোরালেস আমায়া, যার সঙ্গে আমার একটা বন্ধুত্ব মতো গড়ে উঠেছিল, ওকে জিজ্ঞেস করলাম কোথা থেকে শপিং করবো। প্রথমবার বিদেশ থেকে দেশে গেলে সবাই নানান উপহার নিয়ে যায়। আমিও তাই করবো। এফরেন বলল, ও শিগগিরই যাবে লেওনে শপিং করতে, পুরো ফ্যামিলি নিয়ে। তখন আমি ওর সঙ্গে যেতে পারি। এবং এফরেন কথা রাখল। একদিন সত্যিই আমাকে নিয়ে গেল। আমি প্রাণ ভরে শপিং করলাম। নিজের পরিবার, আত্মীয়স্বজন তো বটেই, এমন কি মুম্বাই আর বি আই-এর চেনাজানা লোকেদের জন্যও বাজার করলাম।

নিজের ছেলেকে প্রথম দেখবো, মুম্বাই, কলকাতা, শিলচর, দিল্লী, আগ্রা – এতগুলো সিটিতে যাবো! নিজের এক্সটেনশনের ব্যর্থতা ভুলে এসব আনন্দে টগবগ করে ফুটতে শুরু করলাম। লোপা ও স্বদীপ্তর মেক্সিকান ভিসার জন্য দিল্লীতে কিছু ফর্মালিটিজ পুরো করতে হবে। সেজন্য শুধু আনন্দের জন্য বা মনের শান্তির জন্য নয়, একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজও হাতে নিয়ে যাওয়া।

তবে ইন্ডিয়া যাবার আগে সবচেয়ে দুঃখের কাজটি করতে হল। ছেড়ে দিতে হল আমার এই সাধের অ্যাপার্টমেন্ট। যে অ্যাপার্টমেন্টে লোপা ও লালাকে আনবার সাধ ছিল আমার। গত কয়েকমাস আর একটুও যত্ন করি নি এর। অ্যাপার্টমেন্টের দেয়াল ভরে গেছল উইপোকায়। বাড়ীর অবস্থা দেখে লুই পাবলো কাস্ত্রো অংখেলের কাছে কমপ্লেইন করেছিলেন। আংখেল এরপর লোক পাঠিয়েছিলেন বাড়ী পরিষ্কার করবার জন্য। আমি থাকতেই। শেষের দিকে এই বাড়ীর প্রতি টানই চলে গিয়েছিল। রান্নাবান্নাও অনিয়মিত হয়ে গিয়েছিল। কোনো কোনো উইকেন্ডে প্রত্যেক বেলায় বাইরে খেয়েছি। যাক,

শেষমেশ সময় এলে বাড়ী কাস্ত্রোকে ফিরিয়ে দিয়ে আবার সিমাতেলে এসে উঠলাম ইন্ডিয়া যাওয়ার দুদিন আগে। অফিসও খালি করে দিতে হল।

অবশেষে এল ইন্ডিয়া যাবার দিন। আমার এবারের রুট লেওন-মেক্সিকো সিটি-প্যারিস-মুম্বাই। প্যারিস এয়ারপোর্টে পৌঁছে আমার যাত্রাপথে প্রথম কোনো ভারতীয়র মুখ দেখলাম। মেক্সিকোতে এক গোবিন্দন ছাড়া কোনো ভারতীয়কেই দেখতে না পাওয়া আমাকে ভারতীয়র মুখ দেখবার জন্য তৃষ্ণার্ত করে তুলেছিল। তাই এই প্যারিস এয়ারপোর্টে ভারতীয়দের দেখে আমি যেচে গিয়ে, কোনো দরকার ছাড়াই, একজন পাগড়িধারী শিখ পাঞ্জাবীকে হিন্দীতে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলাম। হিন্দী বলতেও খুবই ইচ্ছে করছিল। দুঃখের বিষয়, সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোক ইংরেজীতে আমার প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন!

এক মাস ভারতে কাটিয়ে এগারো মাস বয়সের ছেলেকে জীবনে প্রথমবার দেখে আবার সেই প্যারিস-মেক্সিকো সিটি-লেওন। লেওন এয়ারপোর্টে আবার সেই একই ড্রাইভার এলেন আমাকে রাইড দিয়ে সিমাতেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ভেবে দেখলাম কত তফাৎ! গত বছর যখন উনি এসেছিলেন আমাকে নিয়ে যেতে, তখন আমার মনে ছিল অ্যাকাডেমিকসে ফেরার আনন্দ আর এবারে শুধুই এক হৃদয়জোড়া বিষাদ – ব্যর্থতার বিষাদ। কতদিনের জন্য এই মেরিদা – কে জানে! মেরিদা যাবার আগে কটা দিন সিমাতেলে থাকতে হল। মিমবেলার সঙ্গে প্রবলেমটা নিয়ে একটু আধটু আলোচনা হল, বিশেষ এগোলো না। আমার মনও আর নেই এসবে। কোনোরকমে এই ব্যর্থতার জায়গা থেকে পালাতে পারলে বাঁচি। হোক মেরিদা এক কম্প্রোমাইসের শহর, হোক উয়াদী এক কম্প্রোমাইসের চাকুরীক্ষেত্র, তবু আমি এখন উয়াদীর, আমি এখন আর সিমাতের কেউ না, উয়াদীতে আমাকে ডাকছে, আমাকে যেতে হবে। আমাকে দু সপ্তাহের জন্য একটি ছোটোখাটো অফিস দেয়া হল সিমাতে, সেখানে থেকে কুমার শানু গ্রুপে লেখা, শানুর গান শোনা, আর বাংলালাইভ নামে একটি বাংলা ওয়েবসাইটের 'মজলিস'-এ মাঝে মাঝে পার্টিসিপেট করা। এভাবেই কাটল আমার গুয়ানাখুয়াতোর শেষ কটা দিন।

প্রতীপ ভট্টাচার্য

উত্তর কলকাতায়

তৃতীয় পর্ব

পূর্বের দুইটি অধ্যায়ে দক্ষিণ ও মধ্য কলকাতার আমার ছেলেবেলার স্মৃতিগুলি বিবৃত করেছি। এবার আমার কিছুকালের উত্তর কলকাতা বাসের স্মৃতি উদ্ধার করে বলছি।

প্রাক স্বাধীনতা যুগের কথা। আমি তখন পাঁচ-ছয় বছরের বালক। ১৯৪১ সাল। তখন আমরা উত্তর কলকাতায় আমার ছোট পিসীমার বাড়ীতে, তাঁর সংসারে বাস করছি, আমরা অর্থাৎ আমার দাদু, মা ও আমি। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ ঘোররূপ ধারণ করেছে, বাবা তখন মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ সেনাদলের সঙ্গে যুক্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ডাক্তার হিসাবে নিযুক্ত আছেন।

আমার ছোটপিসীমারা থাকতেন আপার সার্কুলার রোডে, এখন এ পি সি রোড নামে পরিচিত। প্রশস্ত রাস্তা, মধ্যভাগে ট্রামলাইন। তখন বাড়ীগুলির সামনে চওড়া প্রাঙ্গণের মতো ফুটপাত, তার ওপর একটি রেললাইন পাতা, যেটি বাগবাজার থেকে এন্টালী হয়ে ধাপা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই লাইনটির ওপর একটি ছোট বাষ্পীয় ইঞ্জিন দুটি মালগাড়ী সহ দিনে দু বার যাতায়াত করতো। এটি ছিল শহরের আবর্জনাবাহী রেলগাড়ী। সারা পথটিতে কয়েকটি 'স্টেশন'ও ছিল, সেগুলিতে তার নিকট লোক-বসতিগুলি থেকে জঞ্জাল-আবর্জনা জমা করা থাকতো, ঐ মালগাড়ীটি সেগুলি সংগ্রহ করে যেত। 'কু' বাঁশীর আওয়াজ শ্রবণমাত্র দৌড়ে গিয়ে পিসীমার বাড়ীর দোতলার জানলা থেকে আমরা ছোটরা সকৌতুহলে ছোট্ট রেলগাড়ীটির যাত্রা দেখতাম। পরশুরামের 'কচি সংসদ' গল্পটিতে এই গাড়ীটিকে রঙ্গভরে ধাপা মেল বলে উল্লেখ আছে। বর্তমান ট্রামলাইন ঐ রেললাইনের স্থলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। রাস্তায় এখনকার তুলনায় যানবাহন অত্যল্প ছিল, বাসের সংখ্যাও মুষ্টিমেয়, তিন নম্বর বাসটি খুব জনপ্রিয় ছিল, শ্যামবাজার থেকে এসপ্লানেড ও কালীঘাট হয়ে টালিগঞ্জ ছিল এর গমনপথ। তখন সব বাসই বেসরকারী, অধিকাংশই শিখ মালিকানায় ও চালনায়, চকচকে বিস্কুটের টিনের আকৃতি কিন্তু এদের রক্ষণাবেক্ষণ ত্রুটিহীন। তবে ট্রামই লোকের বেশি পছন্দসই ছিল, এর সংখ্যাও ছিল অধিক। কয়েকটি দোতলা বাসও ছিল, তবে সেগুলি নিতান্তই শ্রীহীন। স্বাধীনতার পর মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় প্রধান রুটগুলি জাতীয়করণ করেন, বাঘ-মার্কা নতুন আধুনিক বাসের প্রচলন হয়।

মানিকতলা বাজারটি বাড়ীর নিকটবর্তী হলেও পিসেমশায় পছন্দ করতেন একটু দূরে শেয়ালদার বাজার। রবিবার ছেলেদের নিয়ে সেখানে পাইকারী দরে সস্তায় পাঁচ সের, দশ'সের পরিমাণের মাছ-শাক-শবজি ও মুদিখানার জিনিস কিনে বহন করে আনতেন বৃহৎ সংসারের জন্য। অবশ্যই হন্টনে, ঐ রাস্তা কোন বাহনে আসার কথা ওঁরা চিন্তাও করতেন না তখনকার দিনে। পিসেমশায় শেয়ালদা কোর্টের উকিল ছিলেন, যাবার সময় ট্র্যামে গেলেও তাঁকে কখনও পদব্রজ ছাড়া কোর্ট থেকে ফিরতে দেখি নি। তখনকার লোকেরা অতি কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন, চূড়ান্ত গরম ছাড়া বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবহারও সীমিত ছিল। হাতপাখার প্রচলন ছিল সর্বদা।

নীচের তলায় পিসেমশায়ের অন্য আত্মীয়রা থাকতেন। সারা বাড়ীতে ছোট-বড় মিলে ডজনখানেক ছেলে-মেয়ে, আমরা দু-তিনজন বালখিল্য ছাড়া সবাই স্কুল বা কলেজের ছাত্র-ছাত্রী। বিকেলে বাড়ীর সামনে প্রশস্ত ফুটপাতের ওপরেই চৌকি পেতে দাদা-দিদিদের নরক গুলজার করে আড্ডা হতো। ঐ তল্লাটে কোনো গৃহস্ত বাড়ীর সংলগ্ন কোনো আঙ্গিনা থাকতো না, সদর দরজা খুলেই ফুটপাতে অবতরণ। অবশ্য বৃহৎ প্রাঙ্গণযুক্ত ভবনগুলি, যথা মূক-বধির বিদ্যালয় বা রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ ইত্যাদি ছাড়া। আড্ডার বিষয়বস্তুর পরিধি সীমাহীন, শৈলেন মান্নার পায়ের যাদু, ব্র্যাডম্যানের

ইংল্যান্ড বোলারদের দুরমুশ করা, প্রমথেশ বড়ুয়া-কানন দেবীর হালের ছবিটিতে তাঁদের অসাধারণ অভিনয়, পঙ্কজ মল্লিক ও সায়গলের স্বর্ণকণ্ঠ ও গানের তুলনা, সুভাষ চন্দ্র বোসের রোমহর্ষক ভারত ত্যাগ, হিটলারের মহাপরাক্রমে ইউরোপ আক্রমণ, দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতি, গান্ধীজির স্বাধীনতা সংগ্রামে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক ... কি নয় সেই সব আলোচনার বিষয়! আমরা ছোটরা হাঁ করে শুনতাম, বুঝতাম না কিছুই তবে বড়দের প্রবল উচ্ছাস, উত্তেজনা ও প্রাণবন্ত আলোচনা শুনে শুনে বিখ্যাত নামগুলি সব মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সর্বাধিক আকর্ষণীয় ছিল বাড়ীর বিপরীত সুকিয়া স্ট্রীটের ও পাড়ার বিখ্যাত তেলেভাজা দোকানের খাবার যা আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে মুখ চালাবার জন্য অপরিহার্য ছিল। সস্তা-গন্ডার দিন, দশ-বারো আনার (এখনকার ৫০-৭৫ পয়সা) আলুর চপ-বেগুণীতে সবার কুলিয়ে যেত। যেদিন বাবা-কাকার ঔদার্যে ছেলেরা টাকাটা-সিকেটা আদায় করতে পারতো, সেদিন তো মহাভোজ, বিপরীতে অবস্থিত দোকান থেকে চপ-কাটলেট আসতো, পুরো নিটোল একটি কারুর ভাগ্যে হয়তো জুটতো না, অর্ধেক ভাগ খেয়েই আমরা সপ্তম স্বর্গে বিচরণ করতাম। সেই সব স্বল্প আয়, পরিমিত সংগতির দিনগুলিতে সাধারণ লোকেরা যে কত অল্পে পরিতুষ্ট হতো তা এই পঞ্চাশ হাজারী মোবাইল-স্মার্ট টিভি-নেটফ্লিক্স-মল, রেস্টুরেন্টের এক-হাজারী মূল্যের প্লেট খাবার, চলচ্চিত্র প্রদর্শনে এক একবারে কয়েকশত টাকা ব্যয়, অনায়াস বিমানে দেশ-বিদেশ ভ্রমণের যুগে কল্পনাপ্রসূত মনে হয়।

মুক্তি চলচ্চিত্রে প্রমথেশ বরুয়া ও কানন দেবী

মা-পিসীমারা ও বড় দিদিরা সাবালক দাদাদের তত্বাবধানে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে হাতিবাগানে চিত্রা সিনেমায় নিউ থিয়েটার্সের 'মুক্তি' চলচ্চিত্রটি দেখতে গেলেন, আমাদের চকলেট-আইসক্রীমের লোভ দেখিয়ে বাড়ীতে রেখে। এই ছবিটি সে যুগে জনপ্রিয়তার সব রেকর্ডই ভঙ্গ করেছিলো, গল্পে, পরিকল্পনায়, উপস্থাপনায় সেটি একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি করে চমকপ্রদ হয়েছিল। রাজকুমার প্রমথেশ বড়ুয়া তাঁর আসামের রাজ্য গৌরীপুরের জঙ্গলে হাতীর পিঠে চিত্রগ্রহণ করেছিলেন, তিনিই ঐ ছবির নায়ক।

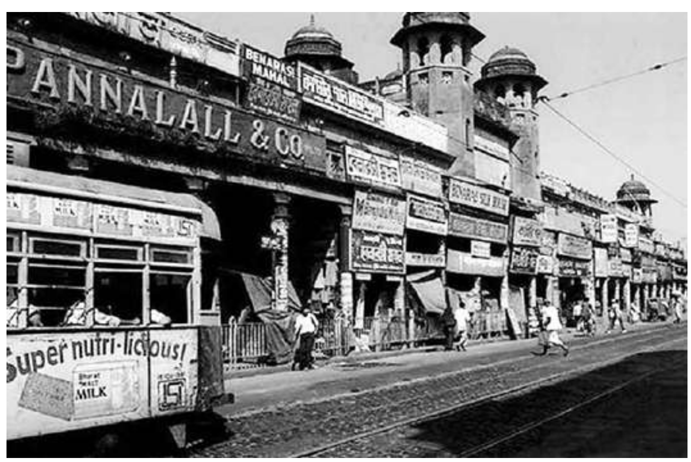

কলেজ স্ট্রীট – কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট

স্টুডিয়োর বাইরে শ্যুটিং এই দেশে সেই প্রথম প্রকল্প, এই অভিনব প্রচেষ্টায় জনসাধারণ প্রচন্ড আকৃষ্ট হয়েছিল। উপরন্তু পঙ্কজ মল্লিকের পরিচালনায় গানগুলি সব হিট, লোকের মুখে মুখে ফিরছে। ছায়াছবিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই প্রথম প্রবর্তন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অনুমতি দিয়েছেন 'আজ সবার রং এ রং মেশাতে হবে', 'বিদায় বেলার মালা খানি' কাননবালার কণ্ঠে ও 'আমি কান পেতে রই' পঙ্কজের কণ্ঠে গান তিনটি ছবিটিতে সন্নিবিষ্ট করার জন্য। আর সোনায় সোহাগার মতো রবীন্দ্রনাথের খেয়া কবিতাটিতে পঙ্কজ মল্লিকের নিজের সুরে, রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়েই, 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' গানটিতে দর্শকদের উচ্ছ্বাস বাঁধনহারা হয়ে গিয়েছিল। গানটির আদর যে সর্বকালীন তা বোঝা গিয়েছিল যখন প্রায় অর্ধশতাব্দী পরেও পঙ্কজ মল্লিকের অনুমতি নিয়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গানটির রেকর্ড শ্রোতারা সমধিক আদরে গ্রহণ করেন। কানন দেবীর সুধাভরা কণ্ঠে চলচ্চিত্রের গান 'তুফান মেল', 'যদি ভালো না লাগে তো দিও না মন' বা 'বিদ্যাপতি' চলচ্চিত্রের 'অঙ্গণ আয়বো জব রসিয়া' মা-মাসীমা-পিসীমাদের কণ্ঠে অসংখ্য বার শ্রবণ করে আমাদের সেই শৈশবেই প্রায় মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল, যার রেশ এই অষ্ট-দশক পরে এখনও মনে গুন-গুনিয়ে ওঠে!

পিসীমার বাড়ীর উত্তরের রাস্তার মোড়ে রামমোহন লাইব্রেরী। সেখানে প্রায়ই সভা-সমিতির উপলক্ষ্যে শহরের বহু মান্য ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমাগম হতো। মা-পিসীমা-দিদিরা নিয়মিত ঐ লাইব্রেরি থেকে বই আনিয়ে পড়তেন। আর দক্ষিণের রাস্তাটি গড়পার রোড। ঐ রাস্তাতেই অবস্থিত বাংলা শিশু-সাহিত্য শিরোমণি সন্দেশ সৃষ্টিকার সুকুমার রায়ের বাসগৃহ, যাঁর অননুকরণীয় 'আবোল তাবোল' বাঙ্গালীমাত্রেরই প্রাণের জিনিস। আর আছে সারা শহরের সুপরিচিত 'বিষ্টু ঘোষের আখড়া'।

শ্রী বিষ্ণুচরণ ঘোষ ও মনোতোষ রায়

তখন ভারত পরাধীন, বিদেশী শাসকের পদানত এক বিক্ষুব্ধ দেশ। যুবকেরা হতোদ্যম, নিরুৎসাহ, তাদের দুর্বল স্বাস্থ্য ও ততোধিক ভগ্ন মনোবল। শ্রী বিষ্ণুচরণ ঘোষ এর প্রতিকার করতে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করলেন, যেথায় ব্যায়ামের মাধ্যমে যুবকদের শরীরগঠন ও মানসিক বিকাশের জন্য নানা বিষয়ের বক্তৃতা-আলোচনার আয়োজন করা হল। তাঁর এই প্রকল্পে ইন্দ্রজালের মতো ফল দেখা গেলো, যুবকদের উৎসাহ, উদ্দীপনা সীমাহীন হয়ে রইল, কিছুদিনের মধ্যে এর খ্যাতি শহরময় ছড়িয়ে পড়লো। এর সভ্যরা অধিকাংশই সাধারণ পরিবারের ছেলে, দুর্লভ পুষ্টিকর আহার তাদের অপ্রাপ্য, ঘরের ভাত-ডাল খেয়েও অধ্যাবসায়ের সাথে নিয়মিত ব্যায়ামে তাদের অপূর্ব পেশিবহুল শরীর শহরবাসীর বিস্ময় ও প্রশংসা অর্জন করলো। এমনকি সাহেবরাও এদের স্বাস্থ্যের তারিফ করতেন, যদিও এই সংস্থানটিকে এঁরা ঈষৎ সন্দেহের দৃষ্টিতেও দেখতেন স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ধারণায়। তারপর যখন মনোতোষ রায় ও মনোহর আইচ বিশ্ব দেহগঠন প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হলেন তখন এই আখড়াটির খ্যাতি সর্বত্র প্রসারলাভ করলো ও বৃটিশ শাসকদেরও সন্দেহের অবসান ঘটলো। ১৯৪৬ সালে দাঙ্গার সময়ে এই সমিতির যুবকবৃন্দ স্বয়ং বিষ্ণু ঘোষের নেতৃত্বে অকুতোভয়ে নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করে শত্রু অধ্যুষিত এলাকা থেকে অগুনতি অসহায় পরিবারকে রক্ষা করে আখড়ায় আশ্রয় ও আহার দিয়েছেন। আমার এক মাসীমার রাজাবাজারের গৃহ থেকে উন্মত্ত গুন্ডাদের হাত থেকে এঁদের দ্বারা উদ্ধার কাহিনী শুনে আমরা শিহরিত হয়েছিলাম। কলকাতার ইতিহাসে এইসব কীর্তি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়ার উপযুক্ত।

এখানে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করছি যা তখন শহরে প্রচুর কৌতুহল ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। এটি অবশ্য আমার শোনা কথা, তবে লোকমুখে এর বহুল প্রচার হয়েছিল। শ্রী বিষ্ণু ঘোষের জামাতা, নাম বোধহয় বুদ্ধদেব বোস ... বুড়ঢা

বোস বলেই তাঁর পরিচিতি ছিল ... এক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত ছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি অশেষ কষ্ট স্বীকার করে কৈলাস-মানসরোবর ভ্রমণ করেন, অধিকাংশ রাস্তাই পদব্রজে, তখন ঐসব পাহাড়ী রাস্তা অতি সংকীর্ণ, বিপদসংকুল, বাস চলাচলের অযোগ্য। সেই তীর্থস্থলে এক সাধু মহাত্মার কৃপায় তিনি রোগ থেকে সম্পূর্ণ নিরাময় হন। এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গে ছিল একটি ছোট মুভি ক্যামেরা ও ফিল্ম, যার সাহায্যে তিনি তাঁর ভ্রমণের চলচ্চিত্র তোলেন, ও ফেরার পর কয়েকটি ছোট হলে তিনি ছবিগুলি প্রদর্শন করেন। মনে আছে রামমোহন লাইব্রেরিতেও এই ছবিটি দেখানো হয়। এটি দেখতে দর্শকদের তখন আগ্রহ ও উৎসাহের অন্ত ছিল না। মনে রাখতে হবে সে যুগে কেদার-বদ্রীনাথ যাত্রাই অতি দুর্গম ছিল ... প্রবোধ স্যান্যালের মহাপ্রস্থানের পথে বইটি স্মরণ করা যায় ... মানস সরোবর তো প্রায় অগম্য গন্তব্যস্থল ছিল।

সেই সময়ের যে ঘটনাটি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে, সেটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শেষ যাত্রার দৃশ্য। ১৯৪১ সাল। কবিগুরু গুরুতর পীড়ায় অসুস্থ ছিলেন, কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ শল্যচিকিৎসকেরা তাঁর জীবনরক্ষার শেষ চেষ্টা হিসাবে অস্ত্রপচার স্থির করেন। কবির দুর্বল শরীর সেই গুরুভার বহনে অসমর্থ হলো, অবশেষে দেখা দিলো সেই অভিশপ্ত ২২এ শ্রাবণ। কয়েকজন পিসতুতো দাদারা ও তাঁদেরই আত্মীয় কয়েকটি ছেলেরা দল বেঁধে আমাকেও সঙ্গে নিলেন, বঙ্গদেশের একটি উজ্জ্বলতম রত্নটিকে অশ্রুজলে, প্রাণের আকুতিতে শেষ বিদায় না দেওয়া তো অমার্জনীয়। মনে আছে রাস্তায় চারদিক ঢাকা পড়ে গেছে অগুণতি লোকের মাথায়। আমি এক দাদার স্কন্ধে আরোহিত, সেজন্য কিছুদূর পর্যন্ত দৃশ্যমান, সবাই ধৈর্য্য ধরে কবির দেহবাহী গাড়ীটির আগমনের অপেক্ষমান। আশী বছর পূর্বের ঘটনাগুলি স্মৃতিতে ম্লান হয়ে গেছে, যেটুকু মনে এখনও জ্বাজ্বল্যমান সেগুলি হলো কবির দেহ সম্পূর্ণ ঢাকা পুষ্পস্তবকে, চারিদিক গৃহের বারান্দা, ছাত থেকে তাঁর উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে গোলাপজল ও পুষ্পাঞ্জলি, অধিকাংশই অবশ্য পড়ছে দর্শকদের শিরোপরি। আর শোনা যাচ্ছে অপরিমিত, অনিয়ন্ত্রিত রোদনধ্বনি, শোকোচ্ছাসের রব। নিকটতম ব্যক্তির প্রয়াণেও বোধহয় এত আন্তরিক বিচ্ছেদবেদনা বিরল! আমি তখনও কোন মৃত্যুর সন্মুখীন হই নি, সর্বজনের এই অদম্য দুঃখের অভিব্যক্তি আমার বাল্যমনকে কেমন যেন বিমূঢ়, বিহ্বল, পীড়িত করে দিয়েছিলো। সবার কথোপকথনে এটুকু বুঝতে পারছিলাম যে যিনি চলে যাচ্ছেন, তিনি এক অনন্য, অপ্রতিম মনীষী যিনি আর কখনও ফিরে আসবেন না ও সেজন্যই এই হৃদয়মথিত কান্না, এতই তিনি সবার কাছে প্রিয়, এতই আপনজন। সেদিন সব বাড়ীতে অরন্ধন, ফল-মিষ্টি খেয়েই সেদিন ক্ষুধা মেটানো হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের মহাযাত্রা

এর কয়েক মাস পরেই আমার বৃদ্ধ পিতামহ স্বর্গীয় হলেন। মার ও আমার গত দু বৎসরাধিক সময়কালে গড়পারে আমার ছোটপিসীমার গৃহে বাস, কারণ সেখানে আমার দাদু অসুস্থতায় জীবনের শেষ প্রান্তে, তাঁর সেবায় মা ও পিসীমা সদা নিয়োজিত। আমার পিতামহ তাঁর কর্মজীবনে অতি উচ্চপর্যায়ের পদের অধিকারী ও রাজসিক আয় উপার্জন করা সত্বেও অপরিসীম অমিতব্যয়িতা ও অদূরদর্শিতার জন্য কোন স্থায়ী গৃহ বা সঞ্চয় করে যেতে পারেন নি, সেই অবিমৃশ্যকারীতার ফলে এই শেষ জীবনে তাঁর এই কনিষ্ঠা কন্যার বাসাতেই নিরূপায় আশ্রয়। বাবা কয়েকদিনের ছুটিতে মধ্যপ্রাচ্যের রণাঙ্গণ থেকে দেশে এসেছিলেন পিতার অন্তিম অসুখের সংবাদে। তাঁর কোলেই মাথা রেখে দাদুর প্রয়াণ, বৃদ্ধ যেন তাঁর একমাত্র পুত্রের উপস্থিতির দূরাশাতেই কোনোক্রমে প্রাণধারণ করে রেখেছিলেন, এবার তিনি মহা শান্তিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। আবার সেই শোকের উচ্ছ্বাস, আর্তরব, ক্রন্দন। এবার মৃত্যু আমার এত নিকটে, নিজগৃহে! বাবা, পিসীমা ও মা'র উচ্ছ্বসিত রোদন দর্শনে আমারও যেন কান্না স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে নির্গত হলো, তার যেন আর বিরাম নেই। বাবার ও ছোট

পিসীমার শৈশবেই তাঁদের মা'র মৃত্যু, দুই মাতৃহারা শিশুকে দাদু সুদূর রাজপুতানায় তাঁর কর্মস্থলে পরিচারিকার সাহায্যে লালন পালন করেছেন, একাধারে পিতা-মাতার স্নেহ, যত্ন, শাসন, শিক্ষা ও পরিচর্য্যায়। এই পিতার উপর তো তাঁদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা তো সীমাহীন, বিশেষতঃ ইনি নিজেই একজন উদ্দ্যমী পুরুষসিংহ ছিলেন, তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তায়, বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব ও কর্মোদ্যমে তিনি সবার অবিমিশ্র বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর জীবনকাহিনী উপন্যাসকেও হার মানায়।

তাঁর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটি ক্ষুদ্র, অখ্যাত গ্রামে জন্ম হলেও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মেধার পরিচয় দিয়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসহ সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন। শিক্ষাশেষে কিছুদিন কলকাতায় অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থেকে তিনি তাঁর অদম্য উচ্চাভিলাষে সুদূর রাজপুতানার (এখন রাজস্থানে) একটি ছোট করদ রাজ্যসরকারের মূখ্য আমলাপদে চাকুরী গ্রহণ করেন। সে যুগের অবিভক্ত বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালীরা যে উন্নতি ও সমৃদ্ধির উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিলেন তা এখন এক অলীক কল্পনা বলে মনে হবে। বিদ্যা, শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্প, যন্ত্রশিল্প, কারুকলা, সংস্কৃতি, বিনোদন সর্ব ক্ষেত্রেই এই রাজ্য তখন শীর্ষে, ভারতের গর্ব ও বিশ্বের আকর্ষণ। এখন রূপকথার সামিল হলেও এটি খাঁটি সত্য, আমার সৌভাগ্য হয়েছে তার দু-তিন দশক পরেও সেই স্বর্ণযুগে বাসের অভিজ্ঞতার। বাঙ্গালীদের তখন বিদ্যা, বুদ্ধি ও মেধার দৌলতে প্রশাসনিক কর্মে বিপুল চাহিদা, সরকারী, বেসরকারী বা করদ রাজ্যগুলি সর্বস্থলেই তুল্যরুপে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে সে যুগে ভারতের সর্বত্র উচ্চ প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত আধিকারিকদের সিংহভাগ ছিলেন বাঙ্গালীরা। দাদুও তাঁর বুদ্ধি ও কর্মে পারদর্শিতায় রাজ্যের মহারাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ও সত্বর এক মন্ত্রীত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন। অতঃপর সেই পদ থেকে উন্নীত হয়ে মূখ্যমন্ত্রীত্বে আরোহণ করা তো কয়েক মাসের অপেক্ষা। এই সব রাজ্যগুলি বৃটিশ সরকারের অধীন হলেও রাজারা স্বাধীনভাবেই রাজ্য চালাতেন ইংরেজ প্রতিনিধির সতর্ক নজরদারীতে যাতে সুশাসন বজায় থাকে, প্রজারা উৎপীড়িত না হয়, এবং অতি অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দিষ্ট খাজনা দেওয়ায় গাফিলতি না হয়। আর রাজ্যগুলির সামরিক বাহিনী ও বিচার ব্যবস্থা ইংরাজদের নিয়ন্ত্রন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে। সেজন্য বৃটিশ প্রতিনিধির সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ, আলোচনা ও আঁতাত প্রয়োজন হত। আর এই কর্মে বাঙ্গালীরাই সর্বাগ্রে। দাদুর সুদক্ষ পরামর্শ ও পরিচালনায় রাজ্যের উন্নতিতে মহারাজা পরিতুষ্ট ও বৃটিশ প্রতিনিধি সন্তুষ্ট। অকালে বিপত্নীক তাঁর তিন কন্যারই বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে, পুত্র কলকাতায় অধ্যয়নরত ও অগণিত দাস-দাসী, পরিচারক, সেপাই-শান্ত্রী সহ এক প্রাসাদোপম ভবনে তাঁর রাজসিক অধিষ্ঠান। যৌথ রাজ্যটির নাম বুঁদি-বাঁশওয়াড়া, যে নাম কবিগুরুর অমর লেখনীতে বাঙ্গালীদের মনে চিরস্থায়ী হয়ে আছে। কাল বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশক।

দাদুর বহুমুখী গুণাবলীর বর্ণনা আমার সাধ্যাতীত। ইংরাজি ও বাংলায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করা ব্যতীত তিনি সংস্কৃতে বিদ্যালঙ্কার উপাধি লাভ করেন ও পরে রাজপুতানায় বাসকালীন হিন্দীভাষায় নৈপুণ্যলাভ করেন। কিন্তু যেটি আমাদের বিস্ময়বিমূঢ় করে সেটি হল তাঁর সখের বিভিন্ন হস্তশিল্প ও কারিগরি বিষয়ে দাদুর অসাধারণ উৎসাহ ও পেশাদারসুলভ পারদর্শিতা। আলোকচিত্র গ্রহণে তাঁর দক্ষতার নিদর্শন আমার পুরোনো এলবামের পাতায় পাতায় এখনো বর্তমান। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁর ক্রীত এক উন্নত মডেলের কোডাক ফোল্ডিং ক্যামেরায় ফিল্ম ও প্লেটে তোলা ছবিগুলি এখনও ঐ বিষয়ে বিজ্ঞরা অতি উচ্চমানের মনে করেন। অশ্বারোহণে দক্ষ, তিনি ছিলেন একজন অত্যুৎসাহী শিকারী। সে সময়ে বুঁদি শহরের আশেপাশের গ্রামগুলিতে নরখাদক বাঘের অত্যাচারে বিপন্ন, প্রাণভয়ে আতঙ্কিত গ্রামবাসীদের নিরাপত্তার জন্য অনেকগুলি পেশাদার শিকারী নিযুক্ত ছিলেন। দাদু ছিলেন সখের শিকারী, বহু রাত্রি তিনি নিজের বিপদ উপেক্ষা করে কয়েকটি বাঘ শিকার করে গ্রামবাসীদের বিপন্মুক্ত করেন। কলকাতার Cuthbertson and Harper কোম্পানী বিশেষ রাসায়নিক পদ্ধতিতে এই ব্যাঘ্রচর্মগুলি সংরক্ষণের উপযুক্ত করে দেয়। তিনি কয়েকটি কুমীর শিকারও করেন ও তাঁর নিজহস্তে প্রস্তুত সেই কুমীরচর্মের কয়েকটি স্যুটকেস তিনি আত্মীয়-বন্ধুদের বিতরণ করেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন বুঁদির বৃটিশ রেসিডেন্টের ভার্য্যা। স্যুটকেসটির সৌন্দর্যে মোহিত সেই বৃটিশ মহিলা ও তাঁর বন্ধুসমাজ দাদুকে অপূর্ব

হস্তশিল্পের জন্য ভূয়সী প্রশংসায় আপ্যায়িত করেন। যে কোন হস্তশিল্পেই তাঁর কর্ম ছিল নিঁখুত, নিজের কয়েকটি বই ও ডায়েরী তিনি এত সুন্দর বাঁধিয়েছিলেন যে সেগুলি পেশাদার দপ্তরীর কর্ম বলে ভ্রম হতো। পরে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তিনি যখন তাঁর কনিষ্ঠ কন্যার উত্তর কলকাতার গৃহে বাস করেছিলেন, তিনি যাবতীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম খরিদ করে সেই দ্বিতল বাসাটি সম্পূর্ণ নিজের পরিশ্রমে বিদ্যুতায়িত করেন, শুধু দুইটি মজুরের কায়িক সাহায্যে। মনে রাখতে হবে সেই সময়ে কলকাতার অধিকাংশ পুরোনো এলাকার সাধারণ লোকের আবাসগুলি বিদ্যুতবিহীন, তখনও গৃহে গৃহে বিদ্যুত সংযোগের প্রবেশ ধীরগতিতে, ঐ শিল্পে দক্ষ কারিগরও বিরল। দাদু নিজ উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় ঐ সম্পূর্ণ অজানা প্রযুক্তির পুস্তক অধ্যয়ন করে যে প্রকারে তিনি এই দুষ্কর কর্মটি সমাপন করেছিলেন, সেটি এখন চিন্তা করলেও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। এবং সেটি এতই ত্রুটিহীন ছিল, যে পরবর্তী তিন দশকেও তার পরিবর্তন বা গুরু মেরামতের প্রয়োজন হয়নি। তাঁর মৃত্যুতে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পরিচিত সকলের মনেই গভীর শোকের ছায়া পড়েছিল, সুদূর বুঁদি রাজ্যেও স্বয়ং মহারাজার নেতৃত্বে একটি শোকসভা পালন করা হয়েছিল, ওই রাজ্যে তাঁর অবদানের কৃতজ্ঞ স্মৃতিতে একটি রাস্তারও নামকরণ হয়েছিল Bhattacharjee Road।

প্রতীপ কুমার ভট্টাচার্য – (বয়স – ৮৪+) পিতার কর্মসূত্রে ব্যাঙ্গালোরেই স্কুল ও প্রাক-ইউনিভারসিটি কলেজে শিক্ষা। তৎকালীন মাইশোর প্রদেশে ইউরোপীয়ান হাই স্কুলের পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান প্রাপ্তির পর যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী পাস (১৯৫৪-৫৮)। তৎপরে একটি আড়াই-বছরব্যাপী মর্যাদাপূর্ণ ট্রেনিং কোর্স ইংল্যান্ডের ম্যানচেষ্টারে এ.ই.আই কোম্পানীতে। কোর্স সমাপনে কলকাতার ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের তাদের তদানীন্তন লন্ডনের হেডঅফিস দ্বারা নিযুক্ত। আরো ৬ মাসের লন্ডনে বিশেষ ট্রেনিং এর পর দেশে প্রত্যাবর্তন ও সিইএসসি তে একাদিক্রমে ৩৪ বছর কর্মের পর ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ার পদ থেকে অবসর গ্রহণ (১৯৯৭)। অবসর জীবনে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা, বই পড়া, ফটোগ্রাফী, ও ফেসবুক, ট্যুইটার ইত্যাদির মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করা ও ইদানীং বাংলা ও ইংরাজিতে পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ ও অন্যান্য সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত রম্য-রচনা লেখায় ব্যাপৃত।

শাশ্বতী বসু

পিজা পাস্তার দেশে
Pisa টাওয়ার

পর্ব ৬

আজ আমরা Pisa টাওয়ার দেখতে এসেছি। হ্যাঁ সেই টাওয়ারটি যার শারীরিক ত্রুটির জন্যই সে পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়ে আছে। যে শহরে এই টাওয়ারটি তারই নাম Pisa। সুতরাং Pisa র টাওয়ার। তাই থেকে Pisa টাওয়ার।

গতকালই আমরা Colossium দেখতে গেছিলাম। সেখানে আমাদের পরিশ্রম বড় কম হয় নি। তাই আমাদের চলন বলন আজ বেশ শ্লথ। জানা গেলো Colossium এ আমরা যে রুটের বাসে গেছি সেই রুটের বাসই Pisa যাবে। কিন্তু সেই বাস এর স্টপেজ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না অনেকক্ষণ ধরে। গুগলে যা দেখাচ্ছে সেটা আমাদের এই চক্ষুষ্মান জগতে ধরা পড়ছে না। শেষমেশ রাস্তার ধারে এক ক্যাফেতে ঢুকে জিজ্ঞাসা করা গেল। ওহো ! 'রসসো কুলোরে বাস ? Cozi Cozi' বলে ক্যাফে মালিক দূরে হাত তুলে দেখালেন। অর্থাৎ 'লাল রঙের রুটের বাস ! ঐ তো ওদিকে'। আমরা অনেক বার grazie grazie বা থ্যাঙ্কু বলে রওয়ানা হলাম। যাক খুঁজে পাওয়া গেল অবশেষে। বাব্বা ! সে যেন এক যুদ্ধ চলছিল এতক্ষণ। বাস খুঁজে পেতেই আমরা বিধ্বস্ত হয়ে গেলাম। ঘড়িতে দেখলাম প্রায় ২০ মিনিট লাগলো বাসের হদিস জানতে। অবশ্য আমাদের খোঁজাখুঁজির একটি ঐতিহাসিক রেকর্ড এখনো অটুট। ১৯৯৩ সাল। প্যারিসের একটি ট্রেন ষ্টেশনের টিকিট বুকিং কাউন্টারে আমরা দাঁড়িয়ে। কর্তা গত চল্লিশ মিনিট ধরে ইংরেজীতে বোঝানোর চেষ্টা করছে আমরা কোন ষ্টেশনের টিকিট চাই। মনে রাখতে হবে বিশ্বায়ন তখন শৈশবে। ইংরেজি জলচল হয়ে ওঠেনি এতটা যা আজ হয়েছে অবাধ বাণিজ্যায়নের সুবাদে। অবশেষে পাক্কা একটি ঘণ্টা পর টিকিট পাওয়া গেছিলো। সে তুলনায় আজকের ২০ মিনিট তো জলভাত।

Pisa তে নেমে চারদিকে তাকাচ্ছিলাম যদি টাওয়ারটার কোন অংশ দেখা যায়। কিন্তু না, ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন নন। বাড়িঘরের আড়াল পড়ে গেছে হয়তো। আকাশে তখন বেশ গনগনে রোদ। হকাররা টুপি বিক্রি করছে দেশের মত। কিছু উঁচুতে দড়ি টড়ি টানিয়ে আর কিছু মাটির ওপর একটা শক্ত প্ল্যাস্টিক পেতে। বেশ বাড়ির দাওয়াতে বসার মত মাটিতে উবু হয়ে বসে অনেকেই কিনছেন। চিৎকার করে কথাও বলছেন টুপিওলার সঙ্গে। বেশ আমাদের দেশের মত ঘরোয়া আবহাওয়া। কিছু বাংলাদেশি হকার দেখলাম ফোনের চার্জার না কী যেন বিক্রি করছেন। শুনতে পেলাম তাঁদের মধ্যে একজন চিৎকার করে বলছেন "মুশকিল হইল এইহানে কাম নাই। আর হবই (সবই) আসে (আছে)"। ও তাই বুঝি ! অথচ দেশের মোট উৎপাদনের নিরিখে তো পৃথিবীর মধ্যে ইতালি প্রথম দশের মধ্যেই আছে। তাহলে এদের থেকেই দেশের আসল চেহারাটা দেখতে পাওয়া যায়।

আমরা সবাই টুপি পড়ে চলছি। চারদিকে দোকান। সুভেনিরের ছড়াছড়ি। দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছি Pisa Tower চত্বর। সে এক সুবিশাল চত্বর বা এদের ভাষায় Piaza। আর এই চত্বরের নামও চমকপ্রদ – The Square of Miracle বা Piaza dei Miracoli। কাছাকাছি পাশাপাশি তিনটে সৌধ বা স্থাপত্য শিল্প দেখতে পাচ্ছি – সত্যিই অপরূপ। এই তিনটি সৌধের মধ্যে The Bapistery সৌধটি দেখে অবাক হয়ে গেলাম এর নয়ন ভোলানো স্থাপত্যশৈলী দেখে। মনে হচ্ছে যেন হাজার হাজার মণি মানিক্য বসানো একটি রাজ মুকুট।

আশ্চর্যের খবর জানা হলো যে এই রাজমুকুটটিও প্রায় আধ ডিগ্রি হেলে আছে Pisa Tower এর মত। এই সৌধটির দরজা গুলোতে অপূর্ব ভাস্কর্য খোদাই করা ও ব্রোঞ্জের এবং আশ্চর্য সুন্দর। ধীরে ধীরে ভেতরে প্রবেশ করলাম আমরা।

The Bapistery সৌধটি যেন হাজার হাজার মণি মানিক্য বসানো একটি রাজ মুকুট।

ভেতরে মেঝেতে ছোট্ট একটা জল ভর্তি জায়গা। ব্রোঞ্জের সুদৃশ্য রেলিং দিয়ে ঘেরা। এই সৌধটিতে ফ্লরেন্সের শিশুদের একসাথে এক একটি দলে অন্তর্ভুক্ত করে ব্যাপটাইস করা হতো। ব্যাপটাইস করতে জলের প্রয়োজন। ভেতরের এই ব্রোঞ্জের রেলিঙ ঘেরা ছোট্ট জায়গাটি আসলে একটি জলাধারকে ঘিরে রেখেছে। যে জল ব্যাপটাইস করতে প্রয়োজন হতো। ফ্লরেন্সে সেন্ট জন এর জন্মদিন ২৪ শে জুন পালন একটা বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান। দিনটি সরকারি ছুটির দিনও। সেদিনকার অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু থাকে এই সৌধটি। এছাড়া সৌধটিতে অনেক খেলা – প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানও হতো বলে জানা যায়। ১২৮৫ সালে ফ্লোরেন্স সিটি ঘিরে যে সীমানা পাঁচিল তৈরি হয়েছিল সেটা এমন ভাবে নির্মাণ করা হয় যাতে The Bapistery সৌধটি ঠিক শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে।

এই সৌধটির আর একটা নাম The Bapistery of Saint John। The Bapistery র ভেতরে John the Baptist এর একটা মূর্তি। John খৃষ্ট ধর্মের একজন প্রথম দিককার প্রচারক এবং Baptiser ছিলেন। তিনি ইসলাম সহ আরও কয়েকটি ধর্মেও সম্মানিত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এই সৌধটির ভেতরে আমরা চারধারে একবার চোখ বুলিয়ে বাইরে চলে এলাম। সময় খুব কম আজ। এখানে পৌঁছতেই দেরি হয়ে গেছে। Pisa Tower দেখাই আজকের মূল আকর্ষণ। সেটা দেখে যদি সময় থাকে তবে আবার এই গুরুত্বপূর্ণ সৌধটিতে আসা যাবে। এবারে আমরা প্রবেশ করলাম the Pisa Cathedral এ।

The Bapistery র ভেতরে John the Baptist এর একটা মূর্তি।

এখানে সেই পুরনো আমলে পোপের নির্বাচন হতো। ইনিও স্থাপত্য সৌন্দর্যে কম যান না। ইতিহাস বলে ভেনিসের the Saint Mark Cathedral এর সঙ্গে রীতিমত সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা ছিল এই Pisa Cathedral এর। কারণ এই দুটি সৌধর নির্মাণ নাকি একই বছরে শুরু হয়েছে। অবশ্য শুধু নয়নরঞ্জক সৌন্দর্যের বিচারে ভেনিসের সেন্ট মার্ক ক্যাথেড্রালকেই বেশি ভাল লেগেছে আমার।

The Pisa Cathedral

ভেতরে ঢুকলাম। ঢুকেই কিন্তু চমকালাম। যেই করিডোর দিয়ে হাঁটছি সেটি আসলে একটি সমাধি স্থান। বড় বড় মানুষ প্রমাণ পাথরের স্ল্যাব দিয়ে মেঝেটি তৈরি। তার ওপরে মৃত সেন্টদের নাম লেখা। গা একেবারে শিউরে উঠলো। যারা নীচে শুয়ে আছেন তারা খ্রীষ্ট ধর্মের এক একজন দিকপাল। খারাপ লাগছিল দেখে যে অনেক টুরিস্টই এদের ওপর দিয়ে জুতো মস্ মসিয়ে হাঁটছেন। পাশ দিয়ে যাবার রাস্তা আছে কিন্তু তারা কেয়ার করছেন না। পাশের রাস্তা ধরে চলছি আর ভাবছি এখান দিয়ে হাঁটতে সবার কী অসুবিধে ?

তবে আমরা ছাড়া আর দু চারজন মাত্র টুরিস্ট এই ক্যাথেড্রালে ঢুকেছেন। আর কাউকে দেখা গেলো না। সবাই Pisa tower এর কাছেই জড় হয়েছে নিশ্চয়ই। এই ক্যাথিড্রালের দেওয়ালে দেখছি অজন্তা গুহার মত ছবি আঁকা। এগুলো Mural বা দেওয়াল চিত্র।

যেখানে বিখ্যাত সেন্টদের জীবনী চিত্রিত। কিছু ইজেলে, কিছু নোটিশ বোর্ডেও তাঁদের জীবনের গল্প লেখা। পড়তে শুরু করার আগেই আমাদের খুদে চিৎকার শুরু করলো। আমাদের চিত্র দর্শন

বড় বড় মানুষ প্রমাণ পাথরের স্ল্যাব দিয়ে মেঝেটি তৈরি। মেঝেটির নীচে বিখ্যাত সেন্টদের সমাধি। তার ওপরে তাঁদের নাম লেখা।

থামাতে হলো। বাইরে বেরিয়ে এলাম পেছনের দরজা দিয়ে। আর কী অবাক কাণ্ড দেখো ! বেরোতেই দেখি সামনে দণ্ডায়মান আমাদের Pisa Tower। লোকে লোকারণ্য। আর দিগন্তব্যাপী শূন্যতার পটভূমিকায় আকাশের গায়ে পরিস্কার হেলে দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের ঈপ্সিত পিসা টাওয়ার। কী বিরাট ! কী তাঁর গাম্ভীর্য ! মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

দেখলাম টুরিস্টরা প্রায় প্রত্যেকেই টাওয়ারের একেবারে ওপর তলায় উঠছেন। সাত তলায়। প্রতিটি তলায় মানুষের মাথা গিজগিজ করছে। আমার খালি মনে হচ্ছে হেলানো টাওয়ার যদি এই লোকের ভারে আরও হেলে পড়তে পড়তে একেবারে পড়েই যায়। তখন ??? অবশ্য এগুলো আমার চিকেন হার্টের অনর্থক চিন্তা শুধু। মনে হয় না এখানকার একটি প্রাণীও এসব নিয়ে চিন্তা করছে। যাই হোক পৌছনোর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার সঙ্গীরাও ছুটল ওপর তলায় উঠতে। অনলাইনের কল্যাণে টিকিট কাটার লাইনে দাঁড়ানোর কোন প্রশ্নই আর আজকাল নেই। সুতরাং কালক্ষেপ না করাই শ্রেয়। প্রচুর লোক তখন ওপর থেকে ঘুরে এসেছেন। বলছেন ঃ

"একদমে দুশো চুরানব্বই সিঁড়ি উঠেছি। তাও আবার সিঁড়িগুলো কেমন ত্যারা ব্যাকা। সোজা নয় ওঠা"। হ্যাঁ সত্যিই এ সিঁড়ি ভেঙে ওঠা নামা করা করা সহজ কাজটি নয়। আরও জানা গেলো এই টাওয়ারে দুশো চুরানব্বইটি সিঁড়ি আছে। সিঁড়িগুলোর লেভেল একদিকে উঁচু একদিকে নিচু। কারণ টাওয়ারের দোতলা যখন সবে বানানো হয়েছে তখনই টাওয়ারটি হেলতে শুরু করেছিল। কারণ ভিতের মাটি যথেষ্ট শক্ত ছিল না নরম ছিল। তখন কাজ অনেকদিন বন্ধ ছিল। যতদিন না আপনা থেকেই মাটি শক্ত হয়। তারপর মাটি শক্ত হলে আবার কাজ শুরু হয়। কিন্তু ততদিনে যা হেলার টাওয়ারটি হেলে গিয়ে স্থির হয়েছে। এরপর তো আরও তলা বানাতে হবে। স্থপতিরা পরবর্তী তলাগুলোর একটি দিক উঁচু আরেকটি দিক নিচু করে তৈরি করতে লাগলেন টাওয়ারের ভারসাম্য রাখার জন্য। তাইজন্য "সিঁড়িগুলো ত্যারা ব্যাকা" হয়েছে।

পিসা ক্যাথেড্রালের দেওয়াল-চিত্র।

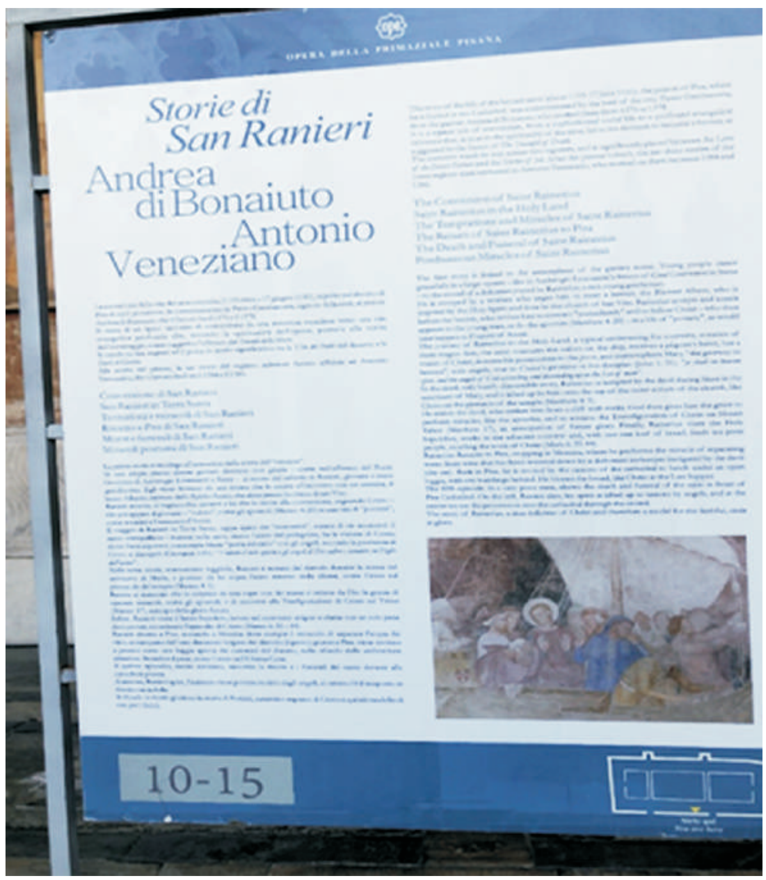

নোটিশ বোর্ডে সেন্টদের জীবনের গল্প লেখা।

সঙ্গীরা ততক্ষণে ওঠা নামা শেষ করে হাঁপাতে হাঁপাতে চলে এসেছে। বলল – সে এক অভিজ্ঞতা বলে বোঝানো যাবে না। মুখে তাঁদের শীর্ষ জয়ের আনন্দ। তাদের কাছ থেকে জানা গেল – Pisa Tower টি আসলে ঐ পাশের ক্যাথেড্রালেরই Bel Tower। ওখানে ঘণ্টা ঝুলনো আছে সাতটি। সেখান থেকেই ক্যাথেড্রালের প্রয়োজন মত ঘণ্টা বাজানো হত।

যেটা শুনে অবাক হলাম সেটা হল সাতটি ঘণ্টা বাজে সরগমের সাতটি সুরে। এই প্রথম আমার মনে হলো ইশ কী জিনিস মিস করলাম ! জানা গেল **১১৭২** সালের ৫ই জানুয়ারী এক ইতালিয়ান বিধবা ভদ্রমহিলা ষাটটি রৌপ্যমুদ্রা দান করেছিলেন। যেটা দিয়ে কিছু পাথর কিনে টাওয়ার এর ভিতে ব্যবহার করা হয়েছিল। সেই নাকি পিসা টাওয়ার নির্মাণের শুরু। তারপর প্রায় **১৯৯** বছর ধরে টাওয়ারটি বানানো হয়। **১৩৭২** সালে ঘণ্টাঘরটি তৈরি হয়। তবে ঘণ্টার সবগুলো লাগাতে আরও দুশো বছর লেগে যায়। সব শেষে বড় ঘণ্টাটি লাগানো হয় **১৬৫৫** সালে।

Pisa tower

সবাই ফটো তুলছে টাওয়ার ঘিরে। বিশেষ করে হেলানো টাওয়ারকে ঠেলে সোজা করার একটা দায়িত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে। এতে কেন কাজ হয় না কে না জানে ! কাজ হলে এই লাখ লাখ লোকের বছরের পর বছরের ঠেলে দেওয়ার ভঙ্গিতে মাত্র চার ডিগ্রি হেলে থাকা টাওয়ার কি সোজা হয়ে যেত না ? অবশ্য না হওয়াটা সত্যিই গুরুতর অন্যায়। সঙ্গীরাও সব এদিক সেদিক ঘুরছে।

Pisa Tower টি আসলে ঐ পাশের ক্যাথেড্রালেরই Bel Tower

অকস্মাৎ ছন্দ পতন। হুড়মুড় করে বৃষ্টি নামলো আকাশ ভেঙে। একদম আচমকা। আর এতো প্রচণ্ড জোরে যে সামনে কী আছে না আছে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সঙ্গীরা ক্ষুদেটিকে নিয়ে কোথায় গেল ? পিসা টাওয়ারের নিচতলায় কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। সুতরাং সেখানে ঢোকা যাবে না। কিন্তু পাশের পিসা ক্যাথিড্রালের ঢোকার পথ তো দেখতে পাচ্ছিনা এই বৃষ্টির তোড়ে। অবশ্য দৌড়ে সেদিকে যেতে গেলেও ভিজে যাবো। উপায় না দেখে যতটা পারি পিসা টাওয়ারের গা ঘেঁসে দাঁড়ালাম। দেওয়ালের গায় কোন কার্নিশ বা আড়াল কিছু নেই। কী করবো দেয়ালের সঙ্গেই মিশে রইলাম। কতক্ষণ পড়ে হঠাৎ যেমন এসেছিল ঠিক সেই ভাবেই বৃষ্টিটা থেমে গেল। আশ্চর্য হয়ে দেখছি আমি যৎসামান্য ভিজেছি। এটা কী করে সম্ভব হলো ? প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি হয়েছে। চত্বরের বাইরে দোকান

গুলোর সামনে জল জমে গেছে। আর আমি প্রায় শুকনো ! মিরাকল, মিরাকল ! মনে এসে গেলো এই চত্বরের নাম তো The Square of Miracle। তাই কী ? মিরাকল এখনও হয় ?

বৃষ্টি থামতেই মুহূর্ত মধ্যে আবার টাওয়ার এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠলো। সঙ্গীরা কোথায় গেলো। খুদেটি কতটা ভিজে গেলো – এসব ভাবতে ভাবতেই খুদেকে দেখা গেলো তার বাবার কাঁধে চড়ে এদিক পানে আসছে। হাতে রেইন কোট। রেইন কোট দেখেই খেয়াল হলো যে আমি তো শীতে প্রায় জমে গেছি। হাত পা বরফের মত ঠাণ্ডা।

– কোথায় ছিলে দিব্যি শুকনো দেখাচ্ছে তো ! রেইন কোট এনেছিলাম তোমার জন্য।

শুকনো দেখাচ্ছে কেন – এই প্রশ্নের বিশদ ব্যাখ্যায় আর এই মুহূর্তে গেলাম না। ওরা ক্যাথেড্রালের ভেতরে ঢুকে গেছিল। তাই ভেজে নি। যাই হোক এই মুহূর্তে আমাদের একটা শুকনো জায়গায় বসা দরকার। আর একটা গরম পানীয়। জুতো মোজা ভিজে সপ সপ করছে। রেস্তোঁরাগুলো সব ভর্তি। সবাই বৃষ্টি থামতেই সেখানে ঢুকে গেছে। অবশেষে মনের মত রেস্তোঁরা না পাওয়া গেলেও। মনের মত ট্র্যাটোরিয়া পাওয়া গেলো। একটু লেস ফর্মাল রেস্তোঁরা ইতালিয় ভাষায় ট্র্যাটোরিয়া বলে। ভেতরে ঢুকেই বুঝলাম হিটার চলছে। জায়গাটা আরামদায়ক উষ্ণতায় ভর্তি। প্রত্যেকটা টেবিলের পাশে আবার গরম ব্লাঙ্কেট মজুত। দেখেই ভীষণ ভাল লাগলো। চটপট বাথরুম ঢুকে গেলাম পায়ের কাদা জল থেকে মুক্ত হতে। ফিরে এসে দেখি টেবিলে গরম ধোঁয়া ওঠা চা। আরাম করে বসলাম কম্বলে পা ঢেকে। দু হাত দিয়ে চায়ের মাগ ধরে তার উষ্ণতা উপভোগ করছি। ওয়েটার এসে খাবার রেখে গেলেন। ওমা! দেখি প্লেট আলো করে সেখানে বিরাজ করছেন কয়েকটি ক্রিস্পি মুচমুচে ফ্রাই। ভাজা জিনিস। কী এটা ? ওয়েটার বললেন – পামকিন-ব্লসম ফ্রিটার।

বাঙালির সেই চিরপরিচিত আদি ও অকৃত্তিম কুমড়ো ফুল ভাজা।

মানে বাঙালির সেই চিরপরিচিত আদি ও অকৃত্তিম কুমড়ো ফুল ভাজা। যদিও প্রকৃতিতে কিছুটা পার্থক্য আছে কিন্তু আকৃতি একেবারে আমাদের তিনি। যদিও কুমড়ো আমাদের দেশের ফল নয়, আমেরিকা থেকে এসেছে এবং কুমড়ো ফুল ভাজার ব্যাপারটাও নাকি আফ্রিকা থেকে এসেছে। কিন্তু সেটা কথা নয়। কথাটা হলো আমার স্মরণ কালের পরিচিত সব বাঙালিই কুমড়ো ফুল চেনে। আমার জ্ঞানে মা এবং দিদিমার কালেও সেটা সত্যি ছিল। এবং একবাক্যে সবাই একে ভালবাসতেন সেটাও শুনেছি। সুতরাং এই ভালবাসার অধিকারেই ইনি খাঁটি বাঙালি বলে আমি মনে করি।

সত্যি পৃথিবীটা গোল। ইউরোপ ভ্রমণের কথা প্রথম শুনেছিলাম কুমড়ো ফুল খেতে খেতে। মোটামুটি আজ আমাদের ইতালি ভ্রমণ শেষ হলো সেই কুমড়ো ফুল ভাজা খেয়েই।

মধুরেণ সমাপয়েৎ।

শাশ্বতী বসু – বর্তমানে সিডনী বাসী। অবসরপ্রাপ্ত সময় কাটে বিভিন্ন ভাল লাগার চর্চা করে। তার মধ্যে পড়া, লেখা, বেড়ানোও আছে। লিখি একটু আধটু, কারণ না লিখে পারি না। গুরুচণ্ডালী, চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম, আবহমান, বাংলালাইভ, প্রতীচী ইত্যাদিতে লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

স্বপ্না মিত্র

পাহাড় চুড়ো

পর্ব ১২ ও ১৩

(১২)

সবসময়ের কাজের মেয়ে মৌসুমি রোদ থেকে শাড়িগুলো তুলে এনে খাটের ওপর রেখে গেছে অনেকক্ষণ। শোয়ার ঘরের এক পাশে রাখা বেতের সোফায় বসে গতকাল প্রকাশিত সানন্দার পাতা উল্টে রান্নার রেসিপিগুলো পড়ছিল শাশ্বতী। তার চোখ চলে যায় ঘড়ির দিকে, ওহ বাবা, চারটে বাজে। ঘড়ির থেকে চোখ ফিরিয়ে সে তাকায় জানলার বাইরে, বিকেল চারটের সময়ও সূর্যের কী তেজ, রোদ এখনও গনগন করছে।

হাতের ম্যাগাজিন মুড়ে সামনের ছোট্ট কাঁচের টেবিলের ওপর রেখে শাশ্বতী উঠে দাঁড়ায়। না, আর বসে বসে গড়িমসি করলে তার চলবে না, বিকেল সাড়ে পাঁচটায় শাশুড়ি মা-কে চা-জলখাবার দেওয়ার আছে, তার আগে শাড়িগুলো গুছিয়ে আলমারিতে তুলে রাখতে হবে।

চা, জলখাবার মৌসুমিই তৈরি করে ট্রে-তে সাজিয়ে দেয়, তবু সে নিজের হাতে চায়ের ট্রে নিয়ে যায় শাশুড়ির ঘরে, দুজনে একসঙ্গে বিকেলের চা খায়, অল্পস্বল্প গল্পও করে। সারাদিনে এই একবার নিয়ম করে শাশুড়ির সঙ্গে দেখা করে শাশ্বতী, অর্ক খুশি হয়। নাহলে তিনতলা বাড়ির একতলায় ভাড়াটে, দোতলায় শাশুড়ি, আর তিনতলায় থাকে শাশ্বতী আর অর্ক, শাশুড়ির সঙ্গে শাশ্বতীর মুখোমুখি হওয়ার প্রয়োজনই পড়ে না।

খাটের ওপর রাখা শাড়ির গাদার দিকে তাকিয়ে শাশ্বতী ভাবে, হেভি সিল্কগুলো আজ রোদ্দুরে দেওয়া হল, ক্রেপ আর শিফনের শাড়িগুলোকেও কয়েকদিনের মধ্যেই হাওয়া খাওয়াতে হবে। পাহাড় প্রমাণ শাড়ির ঢিপের ওপর সস্নেহে হাত রাখে সে। সেই কিশোরী বেলা থেকেই সাজগোজ তার খুব প্রিয়। তবে বিয়ের আগে কেনাকাটা ছিল গুনে-গেঁথে, নিয়ম করে। জন্মদিন, নববর্ষ আর দুর্গাপূজা ছাড়া প্রতিমা কিছু কিনে দিত না। একটা পছন্দের শাড়ির জন্য শাশ্বতীকে কত ঘ্যানরঘ্যানর করতে হত!

বিয়ের পরে সেসব ঝামেলা চুকেছে। এ-বাড়িতে এসেছে থেকে নিজের ছোটখাটো শখ নিয়ে শাশ্বতীকে অত পয়সার চিন্তা করতে হয় না, একটা শাড়ি কেনার ইচ্ছে হলে সে সটান ঢুকে যায় দোকানে। এখন তার আলমারি ভর্তি দামী দামী শাড়ি, একই শেডের দশটা শাড়ি আছে তার। শুধু শাশ্বতীর ইচ্ছে নয়, অর্করও খুব উপহার দেওয়ার নেশা, ঘুরতে ফিরতে দেশবিদেশ থেকে নিয়ে আসে চোখ ধাঁধানো কত উপহার। যতদিন শ্বশুরের রোজগার ছিল, শাশুড়িও কম দেননি শাশ্বতীকে।

খাটের ওপরে রাখা শাড়িগুলো উল্টেপাল্টে গোনে শাশ্বতী, কোন কোন শাড়ি প্রতিমার দেওয়া, কোন শাড়িগুলো শাশুড়ির কেনা, আর কোন কোন শাড়ি অর্ক নিয়ে এসেছিল শাশ্বতীকে চমকে দেওয়ার অভিপ্রায়ে।

প্রতিমার দেওয়া উপহারের দিকে তাকিয়ে শাশ্বতীর চোখের দৃষ্টি খর হয়ে ওঠে, মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। সে মনে মনে ভাবে, মা ভীষণ কিপটে, মা আর বাবার পেনশন মিলে তো টাকার পরিমাণ মন্দ নয়! তবু মেয়ের ঘরে কিছু দিতে হলেই মা-র সব ফুরিয়ে যায়, শুরু করে নেই-নেই গল্প।

দাদার মেয়ের বিয়েতে নিজের অত ভারি সীতাহারটা মা দিয়ে দিল। শাশ্বতীর মেয়ে তনুর জন্য কী রেখেছে মা? ছাতামাতা দু-চারটে মুক্তোর গয়না ছাড়া তনুকে কিছু দেবে বলে মনেও হয় না। মা-বাবা তাদের সবই দাদার সংসারে

ঢালছে, ল্যান্সডাউন রোডের ফ্ল্যাটটাও দাদার নামে লিখে দিল। একুশ বছর বয়সে সেই যে তাকে গয়নাগাটি পরিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়েছে, তারপর থেকে খালি দাদার কোল টেনে চলে মা।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে শাশ্বতী, যাকগে তারও অনেক আছে। মা-বাবার একমাত্র সন্তান অর্ক। শাশ্বতীর ছেলে হল না, একটাই মেয়ে, তনু। তাদের নিজেদেরই এত আছে, সেসব খাবে কে? আর অর্ক যেসব গয়না দিয়েছে শাশ্বতীকে, তা চলে যাওয়া জমিদারির পড়ে থাকা ছিটেফোঁটা গয়নার থেকে অনেক বেশি ভারি ও মূল্যবান। বিয়ের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে শাশ্বতীকে পঁচিশ লাখ টাকার হীরের সেট দিয়েছে অর্ক।

সেই হীরের সেট পরে কোথায় যাবে শাশ্বতী? ভেবেছিল তনুর বিয়েতে একটা জম্পেশ কাঞ্জিভরমের সঙ্গে হীরের সেটটা পরে রাজেন্দ্রাণীর মত সাজবে সে। কিন্তু তনুর বিয়ের প্ল্যান প্রোগ্রাম সবই তো ভেস্তে গেল। কী যে হবে মেয়েটার!

ছোট থেকে হারিয়ে যাওয়া জমিদারির ঝাড়লন্ঠনের গল্প শুনতে শুনতে শাশ্বতীর ধারণা হয়েছিল টাকা থাকলে সব হয়। অর্কর তো অনেক টাকা, তা অর্থ দিয়ে শেষ রক্ষা হবে তো?

প্রতিটি শাড়ি সযত্নে ভাঁজ করে, মলমল কাপড়ে মুড়ে, আলমারিতে রাখছিল শাশ্বতী। হঠাৎ ওপরের তাকের শাড়ির নীচ থেকে বেরিয়ে আসে তার বিয়ের বেনারসি আর অর্কর জোড়। চকোলেট রঙের তাঞ্চই বেনারসিটা হাতে নিয়ে শাশ্বতী অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, এসে দাঁড়ায় জানলার পাশে। বাইরে গনগনে রোদ এতক্ষণে অনেকটা স্তিমিত। তবে উনষাট বছরের শাশ্বতীর চোখ রোদের প্রতি হলেও তার মন ফিরে গেছে নিজের একুশ বছর বয়সে।

ল্যান্সডাউন রোডের তিনতলা গোলাপি বাড়িটার দোতলায় প্রতিমার সঙ্গে শাশ্বতী খুব ঝগড়া করছে। বিকেলে শাশ্বতীকে নিয়ে প্রতিমা গিয়েছিল গড়িয়াহাট মার্কেটে। প্রতিমা পছন্দ করেছিল লাল টুকটুকে কাতান সিল্কের ব্রোকেড বেনারসি। কিন্তু শাশ্বতীর পছন্দ তাঞ্চই, নতুন এসেছে বাজারে। কাতানের বদলে তাঞ্চই বেনারসিতে প্রতিমার অত আপত্তি ছিল না, গণ্ডগোল শুরু হয় বেনারসির রঙ নিয়ে। প্রতিমার মতে বিয়ের বেনারসি হবে লাল বা ম্যাজেন্টা রঙের, সেটাই শুভ। আর শাশ্বতীর পছন্দ একটা গাঢ় চকোলেট রঙের তাঞ্চই, তার ওপর রুপোলী জরির কাজ। দোকানের মধ্যে মেয়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটির উপক্রম হতে বেনারসি না নিয়েই দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছিল প্রতিমা।

শেষ পর্যন্ত শাশ্বতীর জেদেরই জয় হয়েছিল, পরদিন প্রতিমা নিয়ে এসেছিল সেই চকোলেট রঙের তাঞ্চই বেনারসি। সেসব কথা মনে করে এতদিন পরেও প্রৌঢ়া শাশ্বতীর ঠোঁটের ভাঁজে মৃদু হাসি ভাসে। সে উদাস চোখে তাকায় বারান্দার রেলিংয়ে বসা চড়ুই পাখিটার দিকে।

সেদিনও এরকমই গরম পড়েছিল। সোমনাথ আর শাশ্বতী হাঁটছিল গড়িয়াহাটের রাস্তায়। হঠাৎ কাঁচের শো-কেসে একটা কালচে খয়েরী রঙের বেনারসির দিকে আঙুল দেখিয়ে সোমনাথ বলেছিল, "আরে, দারুণ দেখতে তো শাড়িটা!"

শাড়ি নিয়ে সোমনাথের আদিখ্যেতা দেখে শাশ্বতী অবাক হয়, নাক সিটকে বলেছিল, "মোটেও না, এরকম কালচে বেনারসি অশুভ। বিয়ের বেনারসি হবে লাল, সবুজ বা নীল।"

সোমনাথ হেসেছিল, "ওসব কুসংস্কার। তোমার বিয়েতে এরকম অফবিট কালারের বেনারসি পরো, তোমাকে মানাবে।"

শাশ্বতী চোখ পাকিয়েছিল, "কেন, আমার সঙ্গে ঘুরতে ভালো লাগছে না? বেশ বুঝতে পারছি, আমি বিয়ে করে হিল্লি দিল্লী চলে গেলে তোমার সুবিধা হয়।"

ঝটিতি শাশ্বতীর দিকে ফিরে তাকিয়েছিল সোমনাথ। সোমনাথের গভীর দৃষ্টির সামনে আমূলে নড়ে উঠেছিল শাশ্বতী।

তখনও সোমনাথের সঙ্গে তার কোনরকম শারীরিক সম্পর্ক হয়নি। সেক্সি লুকের সোমনাথকে শাশ্বতী কি মনে মনে কামনা করতো? সোমনাথদার হোস্টেলের ঘরে দিন দুপরের ঘটনাটা ছিল পুরোপুরিই অঘটন, দুর্ঘটনা। শাশ্বতী সাহস করে একা চলে গিয়েছিল অসুস্থ সোমনাথকে দেখতে, তাই বলে শরীর দেওয়ার পরিকল্পনা তার ছিল না।

সব নষ্টের গুরুমশাই হল সোমনাথদা নিজে, বিনা নোটিশে শাশ্বতীকে হোস্টেলের ঘরের মধ্যে দেখে মারমুখো হয়ে উঠেছিল যেন, সম্ভব হলে তৎক্ষণাৎ শাশ্বতীকে ঘাড় ধরে ঘর থেকে বের করে দেয়। বিশ্রী মুখ ভঙ্গী করে বলেছিল, "চলে যাও শাশ্বতী, প্লিজ চলে যাও।"

সোমনাথের আস্পর্ধা দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিল শাশ্বতী, সোমনাথকে শাস্তি দেওয়ার অভিপ্রায়ে সে নিজের ঠোঁট চেপে ধরেছিল সোমনাথের ঠোঁটে। তারপর কী যে হয়ে যায়, সোমনাথদা ঠোঁট থেকে গলা বেয়ে নামতেই সে খুলে ধরেছিল নিজেকে। একদিন নয়, মোট চারদিন তারা শরীর ছুঁয়ে খেলেছিল। কিন্তু সত্যিই কি পুরোটা খেলা ছিল? তাহলে বিয়ের দিন সে কেন সোমনাথের পছন্দ মত চকোলেট রঙের বেনারসি পরেছিল?

সব প্রশ্নের বোধহয় উত্তর হয় না, উত্তর খোঁজাও বৃথা। জানলার পাশ থেকে সরে আসে শাশ্বতী। আলমারিতে অর্কর জোড়ের সঙ্গে তার বেনারসিটা যত্ন করে রাখে।

ঘড়ির দিকে তাকায় শাশ্বতী। পাঁচটা বেজে গিয়েছে দেখে আলমারি বন্ধ করে তিনতলা থেকে দোতলায় নামে, সোজা ঢোকে কিচেনে। কিচেনে তখন ট্রে-র ওপর বিকেলের স্ন্যাক্স গুছিয়ে রাখছিল মৌসুমি।

মৌসুমির হাত থেকে ছানার বাটিটা নিয়ে শাশ্বতী বলে, "তুই চা ভিজিয়ে দে, আমি এদিকটা দেখছি।"

দুটো ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুটে মাখন লাগায় শাশ্বতী, এক মুঠো মুগ স্প্রাউটে এক চিলতে লেবুর রস আর এক চিমটে বিটনুন ছড়িয়ে দেয়। চামচ নেড়ে নেড়ে ছানার সঙ্গে মেশায় পুরো এক চামচ চিনি।

চায়ের পাতা কেটলে ভিজিয়ে পাশেই দাঁড়িয়েছিল মৌসুমি, সে বলে, "এতটা চিনি ঢাললে বৌদি, দাদা না বারণ করেছে মাসিমাকে চিনি খাওয়াতে?"

চিনির দানাগুলো চামচ দিয়ে পিষতে পিষতে শাশ্বতী বলে, "ছাড় তো দাদার কথা। মিষ্টি ছাড়া ছানা মা মুখেও দেবে না। এদিকে ছেলে বাড়ি ফিরে খোঁজ নেবে, মা ছানা খেয়েছে? তা ছেলে জানে না নিজের মায়ের স্বভাব?"

মৌসুমি হেসে ফেলে, "যা বলেছ বৌদি। লাঠি নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে, চোখে ভালো দেখে না, তবু কী তেজ! গতকাল ঘরের কোনে ঝুল দেখে আমাকে সাত কথা শুনিয়ে দিল। কত বয়স হয়েছে গো মাসিমার?"

শাশ্বতীর চোখে কৌতুক চিকচিক করে, "এই মার্চে মা-র পঁচাশি পূর্ণ হল। দু-বছর আগে বাবা চলে না গেলে সামনের অগাস্টে বিরানব্বই বছর হতেন। তুই এখন মা-র শুধু তেজ দেখছিস, কম বয়সে এই তেজের সঙ্গে ছিল বাজখাই গলা।"

অল্পবয়সী মৌসুমি খিলখিল করে হাসে, "বল কী বৌদি! তা তুমি সামলাতে কী করে মাসিমাকে?"

"আর সামলানো। আমার বাপের বাড়ি হল বনেদী পরিবার, আর এঁরা উঠতি বড়লোক, অনেক বেশি পয়সা, তাই নিয়ে সারা জীবন খোঁটা দিয়ে গেল বুড়ি। তবে অল্প বয়সে একটা খেলা খেলতাম।"

মৌসুমি হামলে পড়ে, "কী করতে বৌদি?"

শাশ্বতীর ঠোঁটে মিচমিচে হাসি, "সকালে বুড়ি আমার পিছনে কাঠি দিলে, বিকেলে ছেলেকে লড়িয়ে দিতাম মা-র সঙ্গে।"

শাশ্বতীর টেকনিক বোধহয় মৌসুমির মনে ধরে না, সে চা ছাঁকতে ছাঁকতে গোমড়া মুখে বলে, “সামনের মাসে আমার বিয়ে। শাশুড়িটাকে দেখে মনে হয় খুব জাঁদরেল। তবে তোমার মত রূপ তো আর অঙ্গে নেই বৌদি, বর কেন আমার কথায় নাচবে?”

ট্রে-র ওপর বাটি সাজিয়ে পাশে চামচ রাখে শাশ্বতী, গম্ভীর মুখে বলে, “রূপ নয় রে, আসল হল ম্যানিপুলেশন। পাঁচ জন নিয়ে সংসার, প্রত্যেকের কাছেই প্রিয় হয়ে থাকতে হলে ম্যানিপুলেশন ছাড়া উপায় কী!”

মৌসুমি জিভে জড়তা নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, “ম্যানিপুলেশন কী গো বৌদি?”

শাশ্বতী ঝাঁজিয়ে ওঠে, “তোর আর আমার মাথা। ঘড়ির দিকে খেয়াল আছে? শিগগির যা, মা-কে বারান্দায় বসিয়ে দিয়ে আয়। আমি জলখাবারের ট্রে নিয়ে যাচ্ছি, তুই চায়ের ট্রে দিয়ে যাস।”

শাশুড়ি সুরমার মুখোমুখি চেয়ারে বসে শাশ্বতী। আজকাল চোখের জ্যোতি বিচ্ছিরি রকম কমে এসেছে সুরমার। কোন কিছু খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে গেলেই ভুরু জোড়া ভেঙ্গেচুরে একেবেকে কুঁচকে যায়। সুরমা ভুরু কুঁচকে, নাকটা সামান্য ওপরে তুলে দেখে নিল আজ জলখাবারে কী কী আছে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, “তোমার জন্য শুধু একটা বিস্কুট, ছানা কই? টিভির মেয়েগুলোর মত তুমিও ডায়েটিং শুরু করে দিলে না তো?”

শাশ্বতীর মুখে নির্বিকার ভাব, “দুপুরে মাছ খেয়েছি, রাতেও চিকেন হচ্ছে, আমার ছানা খাওয়ার দরকার নেই। আপনি মাছমাংস ছেড়ে দিয়েছেন, তাই আপনাকে নিয়ম করে দু-বেলা ছানা দিই।”

সুরমার গলায় অসন্তোষ, “তোমাদেরও বয়স হচ্ছে। গোপালের ক্লোরেস্টেরল বেড়েছে। সপ্তাহে দু-দিন নিরামিষ খাওয়া ধরলে পারো তো।”

আসলে বছর খানেক আগে অর্কর ব্লাড টেস্টের রিপোর্টে ক্লোরেস্টেরল হাই এসেছিল। তারপর তিন-বার টেস্ট হয়েছে, প্রতিবারই রেজাল্ট নর্মাল। তবু কথায় কথায় অর্ককে নিয়ে টেনশন করা আর তাই নিয়ে শাশ্বতীকে জ্ঞান দেওয়া সুরমার এক রোগ।

সুরমার জ্ঞান বিতরণের প্রচেষ্টাকে পাত্তা না দিয়ে শাশ্বতী জিজ্ঞাসা করে, “চায়ে চিনি ঠিক আছে তো? ব্রাউন সুগারের টেস্ট কেমন লাগছে?”

পঁচাশি বছরের সুরমার এখনও তিনশো ষাট ডিগ্রিতে মাথা চলে। শাশ্বতীর উপেক্ষা লক্ষ্য করে সে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে, চায়ে চিনির মাত্রা নিয়ে কোন উত্তর দেয় না, গলায় কর্তৃত্বের সুর এনে জিজ্ঞাসা করে, “তোমার বাপের বাড়ির খবর কি? সিদ্ধার্থর মেয়ের বিয়ে হল, তা ভাইঝি কেমন আছে?”

সময়ে অসময়ে বাপের বাড়ির প্রসঙ্গ টেনে শাশ্বতীকে কোণঠাসা করার প্রচেষ্টা সুরমার বহু পুরনো স্বভাব। আসলে শাশ্বতীদের বনেদী বংশ হিসেবে সিদ্ধার্থর মেয়ের অত ভালো বিয়ে হয়নি। জামাই সাধারণ প্রাইভেট এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাস করেছে, আহামরি চাকরিও করে না। ভালো বলতে ভবানীপুরে জামাইদের পৈতৃক বাড়ি আছে।

সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে, শাশ্বতী কাঠকাঠ গলায় সংক্ষেপে উত্তর দেয়, “বনেদী বাড়ি তো, খুব ভালো ব্যবহার, বাড়ির বৌয়ের খুব আদর, দাদার মেয়ে সুখে আছে।”

শাশ্বতীর কথার ঠেস যথাস্থানে ঠিক পৌঁছায়, সুরমা কাঁপা কাঁপা হাতে চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে বলে, “তোমার বৌদি বড় ভালো মেয়ে। শাশুড়িকে কত মান্য করে। পতির পুণ্যে যেমন সতীর পুণ্য, ভালোমানুষ মায়ের সন্তানদেরও তেমন ভালো হয়।”

কথাটা বলেই সুরমা বোঝে, এটা অন্যায় হয়ে গেল, কী বলতে সে কী বলে ফেলেছে। শাশ্বতীকে আঘাত দেওয়ার তার ইচ্ছে ছিল না। সে শুধু বেয়াড়া ছেলের বৌ-কে একটু শায়েস্তা করতে চেয়েছিল। কিন্তু ধনুকের তীর আর মুখের কথা, একবার বেরিয়ে গেলে তো আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

সুরমার কথার কষাঘাতে শাশ্বতী স্তব্ধ হয়ে যায়, শুকনো গলায় বলে, "তনু আমার মেয়ে। তবে আপনারও নাতনী মা।"

শাশ্বতীর অভিযোগের সামনে সুরমা গুটিয়ে যায়, ধীরে ধীরে বলে, "আমাদের বংশে কখনও কারও এ রোগ হয়নি। তনুর শরীরে এ উৎপাত কোথা থেকে এলো কে জানে। পাত্রপক্ষদের দোষ নেই, জেনেশুনে খাল কেটে ঘরে কুমীর কে ঢোকায় বল।"

দু-মিনিট আগের শাশুড়ি আর ছেলের বৌয়ের শত্রুতা, দুজনেরই চোখের মণি তনুর মঙ্গলকামনায় এক নিমেষে মিটে গেল।

অর্ক আর শাশ্বতীর একমাত্র সন্তান তনুশ্রী বাড়ির প্রত্যেকেরই অত্যন্ত আদরের। শাশ্বতীর মত রূপ হয়নি তনুর, তাই বলে দেখতে শুনতে মন্দ নয়। লেখাপড়ায় খুব তুখোড়। লা-মার্টিস থেকে স্কুলিং, তারপর প্রেসিডেন্সী। মাস্টার্স করেছে সিঙ্গাপুরে এনইউএস থেকে। বর্তমানে সেখানেই কর্মরতা সে, ব্যাঙ্কিং সেক্টরে আছে।

এই যুগের মেয়ে তনু, ক্লাস টুয়েলভ থেকেই স্টেডি বয়ফ্রেন্ড ছিল। তনুকে অবশ্য শাশ্বতীর মত লুকিয়ে চুরিয়ে প্রেম করতে হয়নি। কারণ অবিনাশের মত অর্ক রক্ষণশীল মানুষ নয়। তনু যখন ক্লাস ইলেভেনে, অর্ক কিছু আঁচ করেছিল বোধহয়, ঠাট্টার ছলে বলে দিয়েছিল, "তনু, প্রেম করতে হলে চুপকে চুপকে পিঠের পিছনে নয়, চোখের সামনেই করিস, আমরা দেখে ধন্য হই।"

আড়ালে শাশ্বতীকে বলেছিল, "মেয়েকে ফালতু শাসন করতে যেও না, তাতে ওরা লুকোতে শেখে। বরং ছেলেমেয়ের ইন-আউট জানা থাকলে মা-বাবা ভুলচুক শুধরে দেওয়ার সুযোগ পায়।"

এক্ষেত্রে অবশ্য তনু কোন ভুল করেনি। ভালো পরিবারের ভালো ছেলে ছিল, মা-বাবা অত্যন্ত অমায়িক, বিয়ের সবই ঠিক, শুধু পাত্র-পাত্রীর কেরিয়ারের কারণে সময়ের অভাব, তাই বিবাহ নামক অনুষ্ঠানটা হয়ে ওঠেনি। তার আগেই ঘটনাটা ঘটে যায়।

হঠাৎ তনুর তলপেটে তীব্র যন্ত্রণা, ধরা পড়ে তনুর বাঁ-দিকের ওভারিতে সিস্ট হয়েছে। বায়োপসি করে দেখা গেল সিস্টের প্রকৃতি বিপজ্জনক। ডাক্তারেরা পরামর্শ দিলেন, শুধু সিস্ট রিমুভাল নয়, পুরোপুরি নিষ্কণ্টক হতে বাঁ-দিকের ওভারিও বাদ দেওয়া প্রয়োজন।

শাশ্বতী আঁতকে উঠেছিল, "কুমারী মেয়ের একটা ওভারি বাদ? সেই মেয়েকে বিয়ে করবে কে?"

অর্ক তেড়িয়া হয়ে বলেছিল, "প্রাণ আগে না বিয়ে আগে? তাছাড়া তনুর বিয়ে তো ঠিক হয়েই আছে। ওনারা কি সমস্যাটা বুঝবেন না?"

সুরমা বলেছিল, "মা-বাবার কথা ছেড়ে দাও। ছেলে নিজেই পিছিয়ে যেতে পারে। পুরুষমানুষ বড় নাক উঁচু জাত, পোকা লাগা ফল মুখে দেবে কিনা আমার সন্দেহ আছে।"

সুরমার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হল। মা-বাবার দোহাই দিয়ে ছেলে বিয়ে থেকে পিছিয়ে গেছে। এক দিকে শারীরিক বিপর্যয়, অন্য দিকে এত বছরের সম্পর্কের ঋণাত্মক পরিণতি, তনু একেবারে ভেঙে পড়েছে।

মেয়েকে শাশ্বতী অনেক বলেছিল, কোলকাতায় ফিরে আয়। তনু শোনেনি, একা একা পড়ে আছে সিঙ্গাপুরে। ন-ঘণ্টা ডিউটি আওয়ার্স, তনু অফিসে বারো ঘণ্টা থাকে। অর্ক বলে, "আসলে কাজের মধ্যে ডুবে থেকে তনু ব্যক্তিগত দুঃখ ভুলতে চায়।"

তনুকে না জানিয়ে শাশ্বতী আর অর্ক মেয়ের অন্যত্র বিয়ের চেষ্টা করেছিল। মেয়ের ছবি, এডুকেশন, ফ্যামিলি দেখে প্রত্যেকেই আগ্রহ দেখায়, কিন্তু মেডিক্যাল হিস্ট্রি শোনার পরে কেউই যেন সাহস পায় না।

শাশ্বতীর চায়ের কাপ ফুরিয়ে এসেছে প্রায়। সে ছানার বাটি সুরমার হাতে দিয়ে বলে, "কত মহিলা যে দুটো ওভারি থাকা সত্ত্বেও সন্তানহীনা, তাহলে? তনুর তো একটা ওভারি আছে, সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা পঞ্চাশ ভাগ কমে গেছে, শূন্য তো হয়নি।"

এক চামচ ছানা মুখে দেয় সুরমা, নরম ছানা নড়নড়ে দাঁত দিয়ে চিবোতে চিবোতে কী যেন ভাবে, বলে, "তনুর যোগ্য পাত্র ছেড়ে বরং একটু নীরেস পাত্র খোঁজো, পাত্র পেয়ে যেতে পারো।"

সুরমার পরামর্শের উত্তরে শাশ্বতী কিছু বলতে যাচ্ছিল।

তার আগেই মৌসুমি পিছন থেকে ডাকে, "ও বৌদি, দাদার জন্য জলখাবারে কি হবে?"

একটু ভেবে শাশ্বতী বলে, "কিমার পুর আছে না? দাদার জলখাবার আমি করে দেব, তুই বরং রাতের রান্না শুরু করে দে।"

মৌসুমি আবার জিজ্ঞাসা করে, "আজ কি চিকেন স্ট্যু আর মিক্সড ভেজিটেবল?"

শাশ্বতী বলে, "হ্যাঁ, তবে স্যালাড কাটবো বড় করে। তুই স্যালাডের সব জলে ভিজিয়ে দে।"

বারান্দা থেকে চায়ের কাপ প্লেট তুলে নিয়ে গেছে মৌসুমি, সুরমা চলে গেছে নিজের ঘরে। শাশ্বতী ভেবেছিল নিজের হাতে অর্কর জলখাবার বানাবে, কিন্তু শাশুড়ির সঙ্গে চা খেতে বসে এমন মেজাজ বিগড়ে গেল, তার আর কিছুই ভালো লাগছে না। সে উঠে এলো তিনতলায়, তার আগে মৌসুমিকে বলে এলো যে অর্ক বাড়ি ঢোকার পরে কিমা পুর দিয়ে স্যান্ডউইচ আর দু-কাপ কফি ওপরে দিয়ে যেতে।

নিজের ঘরে ঢুকে খাটে বসলো শাশ্বতী, টিভি অন করে দিল। এখন তার মাথা ঝনঝন করছে, মন ছটফট করছে তনুর জন্য, টিভিতে কিছু দেখে যদি মন শান্ত করা যায়। বাংলা সিনেমা শাশ্বতীর কোনদিনই পছন্দ নয়। তার ভালো লাগে হিন্দি মুভি, ঝকাস পোশাকআশাক, প্রাসাদপোম ঘরবাড়ি, আর ঘন ঘন নাচ। খুব নাচ শেখার ইচ্ছে ছিল তার, কিন্তু দাদু পারমিশন দেয়নি।

সেরকম জুতসই সিনেমা না পেয়ে ইউটিউবে ট্র্যাভেলগ চালিয়ে দিল শাশ্বতী। সে দেখছিল গঙ্গার উৎপত্তিস্থল গোমুখ যাত্রা। আকাশচুম্বী হিমালয়ের গা-ঘেঁষে বহে চলেছে গঙ্গা। এখানে গঙ্গা নদীর কী তেজ! পাহাড়ের গা বেয়ে চলে গেছে সরু রাস্তা, সেই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তীর্থযাত্রীরা।

নির্জন দুপুরে সিনেমা নয়, শাশ্বতী প্রায়ই টিভিতে ট্র্যাভেলগ দেখে। নদী, সমুদ্র, পাহাড়, অরণ্যে ঘুরে বেড়ানোর ভিডিও। সেসব দেখতে দেখতে তার মন হুহু করে ওঠে। সে খুব বেড়াতে ভালোবাসে, খুব। কিন্তু অর্ক পুরো উলটপুরাণ, বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারে ভীষণ অলস। অর্ক দু-হাতে রোজগার করে, খরচও করে দেদাড়, শাশ্বতীকে শাড়ি গয়না দিতে কোন কার্পণ্য নেই। কিন্তু প্ল্যান করে ছুটি নেওয়া, আগে থেকে টিকিট কাটা, হোটেল বুকিং, এসব অর্কর ধাতে নেই। তাই পয়সা আর স্বাস্থ্য, দুটোই থাকা সত্বেও তেমন কোথাও কোনদিন বেড়াতে যাওয়া হয়নি তাদের।

বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে ওঠে শাশ্বতীর। এত দেখে, এত বেছে তার বিয়ে হল। কী এমন বিয়ে হয়েছে শাশ্বতীর? কী এমন সুখ জুটেছে তার কপালে? সোমনাথদার সঙ্গে বিয়ে হলে এইটুকু সুখ কি তার জীবনে থাকতো না? বরং বেটার হত, শাশ্বতী নিশ্চিত। কারণ সোমনাথদার সঙ্গে তার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল, একটা নীরব বোঝাপড়া। এই যে যখন তখন শাশ্বতীর ইচ্ছেকে অর্ক বুড়ো আঙুল দেখায়, সেটা সোমনাথদা কোনদিন করতো না।

বিয়ের পরপর কিন্তু শাশ্বতী মজেছিল অর্কতে। শুধু তো শাড়ি গয়না নয়, চুমু আর ছোঁয়াছুঁয়ির খেলাও নয়, বিরাট শোয়ার ঘরে ইংলিশ স্টাইলের পালঙ্কে শুয়ে শরীরে ডুবে যাওয়াও ছিল।

শোয়ার ঘরের দক্ষিণ-দিকে দেওয়াল জোড়া কাঁচের জানলা, সাদা রঙের ফিনফিনে নেটের পর্দা ছিল তাতে। সেই পর্দা উড়িয়ে দখিন হাওয়া ঘরে ঢুকে মুখ রাখতো শাশ্বতীর নগ্ন স্তন বৃন্তে। চাঁদের আলো গা এলিয়ে পড়ে থাকতো বিছানায়, অর্ক খেলতো শাশ্বতীর শরীর নিয়ে, উল্টে পাল্টে ছিঁড়ে খুঁড়ে দেখতো তাকে, নিজের শরীর মেলে ধরত শাশ্বতীর সামনে। শুধু মাত্র সেক্সের জন্যই কতদিন অফিস কেটে বাড়ি চলে এসেছে অর্ক। তারপর এই খাটে ঢেউ উঠেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দলিত মথিত হয়েছে দুজনেই।

তখন দিনগুলো ছিল অন্যরকম, বড় রঙিন। সোমনাথদার স্মৃতি মনে পড়তো, তবে অর্কর সঙ্গে বর্ণময় সম্পর্কের পাশে তা দ্রুত ফিকে হয়ে এসেছিল। তনুর জন্ম হয়েছে, কেরিয়ারে ধাপে ধাপে ওপরে উঠেছে অর্ক, কখন যেন শাশ্বতীর সঙ্গে অর্কর হোরিখেলায় রঙে কম পড়েছে। আর সেই অবসরে আবার ঢুকে এসেছে সোমনাথদা, এ যাত্রায় যেন পাকাপাকি ভাবে গেড়ে বসেছে শাশ্বতীর হৃদ কমলে। বৃষ্টির দিনে, নির্জন দুপুরে, বাগানে গাছ আলো করে ফুল ফুটলে, আজকাল শাশ্বতীর বড্ড মনে পড়ে পুরনো কথা। সোমনাথদার মুখ আলো হয়ে ভাসতে থাকে মনের মাঝে, সেই আলোয় জীবন বর্ণময় না হোক, দিনগুলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

শাশ্বতীর চোখ ছিল টিভির দিকে, মন ছিল অতীতে। হঠাৎ সে নড়ে বসে, দোতলায় অর্কর গলা, না? মা-র সঙ্গে কথা বলছে ছেলে।

শাশ্বতী মুখ বাঁকায়, ঢং, মাতৃভক্তি দেখে আর বাঁচি না! তিনশো পঁয়ষট্টি দিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে প্রথমে মা-র খোঁজ নেওয়া চাই-ই চাই। কেন, বৌ আর মেয়ে কি ফ্যালনা?

*** *** *** *** ***

(১৩)

তিনতলা থেকে দোতলায় নেমে শাশ্বতী দেখে, অর্ক দোতলার বাথরুমে ঢুকেছে ফ্রেশ হতে। তিনতলায় শাশ্বতী আর অর্কর শোয়ার ঘর হলেও, দোতলাতেও তাদের একটা নিজস্ব ঘর আছে। দোতলার ঘরটা প্রধানত অর্ক ব্যবহার করে, অর্কর জামাকাপড় এই ঘরের আলমারিতেই থাকে।

অফিস থেকে ফিরে অর্ক গায়ের ব্লেজারটা খাটে ছুঁড়ে ফেলেছিল, সেটা খাট থেকে তুলে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে দেয় শাশ্বতী। আলমারি থেকে এক সেট ইস্তিরি করা পাজামা-পাঞ্জাবী বের করে খাটের ওপর রাখে। কিচেনে ঢুকে দেখে, মৌসুমির স্যান্ডউইচ বানানো শেষ, কফির কাপে চিনি মেশাচ্ছে।

শাশ্বতী জিজ্ঞাসা করে, "স্যান্ডউইচে চিজ দিয়েছিস?"

মৌসুমি মাথা নাড়ে, "না, তুমি সেদিন বারণ করে দিলে তো।"

শাশ্বতী বলে, "হ্যাঁ, দেখে নিলাম, তোর মনে আছে কি না।"

শাশ্বতী বেরিয়ে যাচ্ছিল রান্নাঘর থেকে, মৌসুমি ডাকে, "ও বৌদি, শোনো।" গলা নামিয়ে আবার বলে, "বিকেলে তোমার আর মাসিমার গল্প শুনেছি। তুমি কি সুখিয়া স্ট্রীটে জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিলে?"

শাশ্বতীর ভুরু কুঁচকে যায়, "না, এখনও যাইনি, কেন বল তো?"

মৌসুমির গলায় সামান্য দ্বিধা, "আগে আমি যে বাড়িতে কাজ করতাম, সেই বাড়ির বৌদির বাঁধাধরা জ্যোতিষী ছিল, শ্যামবাজারে বসে, যা বলে সব মিলে যায়। তুমি চাইলে সেই জ্যোতিষীর নাম, ফোন নম্বর, ঠিকানা সব এনে দিতে পারি।"

মৌসুমির আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে শাশ্বতী বলে, "আগের বাড়ির বৌদির ফোন নম্বর আছে তোর কাছে?"

"না, ফোন নম্বর নেই। তবে বাসে মোটে চারটে স্টপ। যাবো আর চলে আসবো। তুমি বললে আমি কালই এনে দিতে পারি।"

শাশ্বতী হেসে ফেলে, "আর সেই ফাঁকে হবু বরের সঙ্গে এক ঘণ্টা কাটিয়েও আসবি, তাই তো?"

মৌসুমি চোখ নিচু করে কফির কাপে চামচ নাড়তে থাকে। সেদিকে চোখ রেখে শাশ্বতী বলে, "আচ্ছা যাস, শ্যামবাজারের জ্যোতিষীর ঠিকানা জোগাড় করে আনিস। তবে আগামীকাল নয়, পরশু দুপুরে ঘুরে আসিস। এখন তাড়াতাড়ি ড্রয়িংরুমে কফি দিয়ে যা।"

শাশ্বতী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ড্রয়িংরুমে ঢোকে, সিলিং-ফ্যান আর ঘরের কোনে রাখা স্ট্যান্ডিং-ফ্যান দুটোই চালিয়ে দেয়। উফ, যা গরম পড়েছে! অর্কর আবার খুব গরমের বাতিক। তবে রাতে শোয়ার সময় ছাড়া সাধারণত তারা এয়ারকন্ডিশনার চালায় না, সারাদিন এসির হাওয়ায় থাকলে চামড়া বড্ড ড্রাই হয়ে যায়।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে ধোপদুরস্ত পাজামা পাঞ্জাবী পরে অর্কও চলে আসে ড্রয়িংরুমে। ততক্ষণে সেন্টার টেবিলের ওপর মৌসুমি রেখে গেছে স্যান্ডউইচ আর কফির ট্রে।

সোফায় হাত-পা ছড়িয়ে বসে অর্ক তাকায় স্যান্ডউইচের দিকে, জিজ্ঞাসা করে, "কীসের পুর? পনীর নয় তো?"

অর্কর উলটোদিকের সোফায় বসে পা দোলাতে দোলাতে শাশ্বতী বলে, "খেয়ে দেখো।"

এক কামড় স্যান্ডউইচ মুখে নিয়ে অর্ক খুশির হাসি হাসে, "ওয়াও, মাটন কিমা, কে করেছে, তুমি?"

অর্কর এই এক বাতিক, ভীষণ পেটুক, সবসময় খাই খাই করে। আর কাজের লোকের হাতের রান্না নয়, তার চাই শাশ্বতীর হাতের তৈরি নানান স্বাদের খাবার। অল্প বয়সে শাশ্বতী নিজের হাতেই করতো, আজকাল আর পেরে ওঠে না। আসলে ইচ্ছেও করে না, তনুর অসুখ যেন শাশ্বতীর সব এনার্জি শুষে নিয়েছে।

শাশ্বতী মাথা নাড়ে, "হ্যাঁ, পুর আমি করেছি।"

মুখের স্যান্ডউইচ শেষ করে কফির কাপে দীর্ঘ চুমুক দেয় অর্ক, সোফায় পিঠ এলিয়ে হাত বাড়িয়ে দেয় শাশ্বতীর দিকে, "তোমার পাশে টিভির রিমোটটা, দাও তো।"

অর্কর অনুরোধে শাশ্বতী তাকায় রিমোটের দিকে, কিন্তু নড়ে না, তার কপালে হাল্কা ভাঁজ, "এই তো এলে বাড়িতে। পরে টিভি দেখো। আগে শুনে নিই সব। মিঃ চ্যাটার্জি আর কোন খবর দিলেন?"

শাশ্বতীর প্রশ্ন অর্ক শোনে, তবে উত্তর দেয় না, বিন্দাস চিবুতে থাকে মুখের স্যান্ডউইচ।

শাশ্বতী আবার জিজ্ঞাসা করে, "কী হল, কিছু বলছ না যে, আজ তোমার সঙ্গে চ্যাটার্জির কোন কথা হয়নি?"

অর্কর চোখেমুখে শরীরে কর্তৃত্বের ভাব যেন, সে গম্ভীর গলায় বলে, "রিমোটটা দাও তো আগে।"

এইবার শাশ্বতী বিনা বাক্য ব্যয়ে টিভির রিমোট এগিয়ে দেয়।

অর্ক টিভি অন করে শাশ্বতীর দিকে তাকিয়ে বলে, "আমার আইপ্যাডটা এনে দাও তো, শোয়ার ঘরে বেডসাইড টেবিলের ওপর রাখা আছে।"

অর্কর উন্নাসিকতায় শাশ্বতীর গা জ্বলে যায়, সে মনে মনে গাল পাড়ে, নবাবপুত্তুর আমার, হুকুম করছেন, আমি যেন ওনার কেনা বাঁদি, কেন ভগবান পা দেননি এক জোড়া?

তবে শাশ্বতী মুখে কিছু বলে না, আবার অর্কর হুকুমও তামিল করে না। সে একইভাবে সোফায় বসে পা দোলাতে দোলাতে একটু গলা তুলে বলে, "মৌসুমি, তিনতলা থেকে দাদার আইপ্যাডটা নিয়ে আয় তো।"

মিনিট কুড়ি অর্কর সঙ্গে বসে টিভি দেখে শাশ্বতী উঠে পড়ে। অর্ক এখন টিভিতে ছাইপাঁশ খবর গিলবে, ওসব খবরে শাশ্বতীর রুচি নেই। শাশ্বতী উঠে চলে যাচ্ছে দেখে অর্ক নড়ে বসে, তাড়াতাড়ি টিভি মিউট করে বলে, "কী জিজ্ঞাসা করছিলে তুমি? চ্যাটার্জি আজ অফিসে আসেনি।"

এইবার রাগ নয়, শাশ্বতীর কান্না পেয়ে যায়। সে মনে মনে অভিসম্পাত দেয় অর্ককে। কী বদমাইশ মানুষ! গত সাতদিন ধরে শাশ্বতীকে ক্রমাগত ল্যাজে খেলাচ্ছে। কে এক চ্যাটার্জি আছে নাকি অর্কদের অফিসে, ভদ্রলোকের চেনাজানা ঘটক আছে। আর তনুর বিয়ে ঘটক ছাড়া কে ঠিক করে দেবে? আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের কাছে তনুর জন্য পাত্রের খোঁজ করতে শাশ্বতীর মানে লাগে। পাত্রের খোঁজ তো কেউ দেয় না, উল্টে তনুর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে অতিরক্ত কৌতূহল দেখায়, সমবেদনা প্রকাশ করতে আহা উঁহু করে, অযথা জ্ঞান দেয়।

ঘটকের পরামর্শ দিয়েছিল সুরমা, কথাটা মনে ধরেছিল শাশ্বতীর। ঠিক কথা, ঘটক ঘটকালী করে পয়সার প্রয়োজনে, আর ঈশ্বরের কৃপায় শাশ্বতীদের পয়সার অভাব নেই। তনুর বিয়ে ঘটকের সাহায্যে স্থির করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

সেই ঘটক নিয়ে শাশ্বতীকে লেজে খেলানো শুরু করেছে অর্ক, আজ নয় কাল করেই যাচ্ছে। কেন, তনুর সৎ পাত্রে সম্প্রদাতি হোক, বাবা হয়ে অর্ক কি তা চায় না?

শাশ্বতীর মুখের প্রতিক্রিয়া দেখে অর্ক টিভি অফ করে দেয়, দু-হাতের করতল দিয়ে কপালের দু-পাশ চেপে ধরে চীৎকার করে ওঠে, "কী চাও তুমি শাশ্বতী? তোমার জ্বালায় তো আমার পাগল হওয়ার উপক্রম! পয়সার জোরে কী কপালের লিখন বদলানো সম্ভব?"

অর্কর অগ্নিমূর্তি দেখে শাশ্বতী স্তব্ধ হয়ে যায়। তাকিয়ে দেখে, লাঠি হাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কখন যেন সুরমা এসে দাঁড়িয়েছে ড্রয়িংরুমের দোরগোড়ায়। সে আর কোন কথা না বলে চুপচাপ উঠে আসে তিনতলায়।

তিনতলায় শোয়ার ঘর অন্ধকার ছিল। ঘরে ঢুকে শাশ্বতী আলো জ্বালায় না। অন্ধকার ঘরে জানলার পাশে প্রেতমূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে। আজ অমাবস্যা। আকাশে চাঁদ নেই। শাশ্বতীর জীবনের অন্ধকারই যেন ছড়িয়ে পড়েছে চরাচরে।

খুব ছোট থেকেই শাশ্বতীর স্বভাব, সামনের মানুষটিকে টেক্কা মারা, তাকে পদে পদে টক্কর দেওয়া। স্কুলে পড়ার সময় সে বুঝতো, তাকে দেওয়া জেঠু আর পিসীর খোদ লন্ডন থেকে আনা উপহারগুলো গোপা চোখ গোলগোল করে দেখে। তাই কথায় কথায় সে তার লন্ডন-বাসী আত্মীয়দের গল্প শোনাত মালাকে। আবার রুমিদি অত সুন্দর নয়, তাই ঠারেঠোরে রুমিদিকে সে বুঝিয়ে ছাড়ত যে তার নিজের অপ্সরা সম রূপ। বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল দাদা। ছলে, বলে, কৌশলে সে প্রমাণ করে দিত দাদু আর ঠাম্মা তাকে বেশি ভালোবাসে। তার এই টক্কর মারার প্রবণতার কারণেই সে বিয়ে করতে পারলো না সোমনাথদাকে।

সোমনাথদার সঙ্গে বিয়ে হলে ধ্যাড়ধ্যাড়ে গ্রামে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে পর্ণা হাসত, রুমিদি নাক সিটকাতো, দাদা বিদ্রূপ মন্তব্য ঝাড়ত, যা চিন্তা করাও তার পক্ষে অসহ্য। কিন্তু শেষ রক্ষা হল কোথায়, সেই তো শাশ্বতী পড়ে গেছে গভীর খাদে। সন্তানের কষ্ট যে নিজের কষ্টেরও অধিক। অর্ক অত্যন্ত স্বার্থপর, নিজের কাজ নিয়েই মজে আছে। এখন কী উপায় হবে তনুর? জীবন সায়াহ্নে সন্তানের সাফল্য মা-বাবার পথ চলার আলো। অবশ্য তনু কেরিয়ারে কম কৃতী নয়, তিরিশ বছর বয়সে তার ওভারিতে সিস্ট নেহাতই এক দুর্ঘটনা, ভাগ্য বিপর্যয়। আর ভাগ্যের সঙ্গে তো পাঞ্জা লড়া যায় না! উজ্জ্বল ছাত্র সোমনাথের জন্ম অজ পাড়াগাঁয়, সেও তো তার ভাগ্য ছিল। তবু সোমনাথের জন্মস্থান নিয়ে শাশ্বতীর পরিবার পরিহাস করতে পিছপা হয়নি। জানলার বাইরে গাঢ় অন্ধকারের প্রতি চোখ রেখে সোমনাথের জন্য শাশ্বতীর মন হুহু করে কেঁদে ওঠে। সে চোখ বোজে, মনে হয় এই তো সেদিনের ঘটনা, চোখের তারায় ভাসে এক তরুণের অপমানে কালো হয়ে যাওয়া মুখ। সেদিন ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে তরুণটি সাহস করে এসেছিল শুধু শাশ্বতীর ভালোবাসার ভরসায়। কিন্তু শাশ্বতী সেই ভরসার মর্যাদা রাখতে পারেনি। সেদিন যদি সে তরুণটির পক্ষ নিত, তাদের দুজনকেই দাদা ছাড়ত না, ভেঙে হাড় গুঁড়িয়ে দিত।

নিজের ভাবনায় ডুবে ছিল শাশ্বতী, কখন যে অর্ক এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে, তা সে টের পায়নি। অর্ক আলতো করে হাত রাখে শাশ্বতীর কাঁধে, শাশ্বতী চমকে ফিরে তাকায়। এই মুহূর্তে অর্ককে দেখে আনন্দ নয়, তার শরীর রি-রি করে উঠলো ঘৃণায়। এই লোকটা, এই লোকটার জন্যই সে সোমনাথদাকে দুঃখ দিয়েছিল। পরিবর্তে কী দিয়েছে অর্ক? মা, বাবা আর ছেলে মিলে সারাজীবন লাঠি ঘুরিয়ে গেল শাশ্বতীর ওপর। একদিকে শাড়ি আর গয়না দিয়েছে অফুরান, অন্যদিকে প্রতিমার পাঠানো তত্ত্ব নিয়ে সমালোচনা করেছে অহোরাত্র। সবসময় সিদ্ধার্থর অযোগ্যতা নিয়ে হাসে অর্ক। অর্কর বাবা ছিলেন পসারওয়ালা ডাক্তার। তার তুলনায় শাশ্বতীর বাবা অবিনাশ বড়ই সাদামাটা। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে সে কথা অর্ক পদে পদে বুঝিয়ে দিয়ে আসে। ভাগ্যিস ঘর অন্ধকার, তাই শাশ্বতীর মুখের অভিব্যক্তি অর্কর চোখে পড়ে না। অর্কর কণ্ঠস্বর ভারি শোনায়, "আজ চ্যাটার্জি এসেছিল অফিসে।"

শাশ্বতী খর স্বরে জিজ্ঞাসা করে, "নীচে যে বললে আজ চ্যাটার্জি আসেনি?"

"নীচে মা ছিল, মৌসুমি আছে, তাই বলতে চাইনি। চ্যাটার্জি একটা সম্বন্ধ এনেছে, ছেলে ডিভোর্সি।" শাশ্বতী আকাশ থেকে পড়ে, "মানে?"

অর্ক একইভাবে বলে, "মানে আর কী, খুঁতো মেয়ের জন্য খুঁতো ছেলে।"

এইবার শাশ্বতী চেঁচিয়ে ওঠে, "ইয়ার্কি নাকি! এমন বিয়ে হওয়ার থেকে না হওয়া ভালো।"

জানলার পাশ থেকে সরে এসে আলোর সুইচ অন করে দেয় অর্ক, সারা ঘর ভরে ওঠে ঝলমলে আলোয়।

শাশ্বতীর চোখে চোখ রেখে অর্ক বলে, "আমারও তাই মত। ছেড়ে দাও এই পাত্র খোঁজা। এক সময় তনু ঠিকই মানিয়ে নেবে তার শারীরিক পরিস্থিতির সঙ্গে।"

সকালে স্নান করে শাশ্বতী পরেছিল থ্রি-কোয়ার্টার ঝুলের ফুলছাপ কটন-ক্যাপ্রি আর একটা ঝোলা টি-সার্ট। প্রতিদিনই রাত-পোশাক পরার আগে সে শোয়ার ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকে হাল্কা শাওয়ার নেয়, সাদা তুলতুলে টাওয়েল দিয়ে গা মুছে গলায় পিঠে ছড়িয়ে দেয় অনেকটা ট্যালকম পাউডার। বৌয়ের বুকের সুগন্ধি ব্যতীত অর্কর আবার ঘুম আসে না।

সে আই-ক্রিম লাগায় চোখের নীচে, অ্যান্টি এজিং নাইট ক্রিম ঘষে ঘষে মুখে মাখে, হাতে ক্রিম লাগিয়ে কটন গ্লাভস পরে নেয়। হাজার ব্যস্ততা, মনখারাপের মাঝেও রূপচর্চা কখনও বাদ দেয় না শাশ্বতী, বিশেষত রাতের এই পনেরো মিনিটের নিয়মটুকু। সে খুব ভালো করে জানে, এই রূপই তার জীবনের প্রধান মূলধন। আর মূলধনের মূল্য বোঝে না, এত বোকা শাশ্বতী নয়।

তার বেশিরভাগ নাইটিই সাদা অথবা খুব হাল্কা রঙের, অবশ্যই হান্ড্রেড পার্সেন্ট কটন। শাশ্বতীর আজকের নাইটিটা বড় সুন্দর, গত মাসেই কিনেছে বুটিক থেকে, হাফ-হাতা সাদা নাইটির বুকের কাছে বেবি পিঙ্ক রঙের সুতো দিয়ে হানিকম্ব করা।

নাইটি গলিয়ে হেয়ার ব্যান্ড দিয়ে শক্ত করে চুল বাঁধে শাশ্বতী। বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখে অর্ক এসে গেছে শোয়ার ঘরে, জানলার পাশের সোফায় বসে, তার হাতে রেড-ওয়াইনের গ্লাস। আফটার ডিনার আ স্মল গ্লাস অফ রেড ওয়াইন অর্কর প্রতিদিনের রুটিনের মধ্যে পড়ে।

ঘরে এখন এয়ারকন্ডিশনার চলছে, তাই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মনোরম আবহাওয়া। বেডসাইড রিডিং-ল্যাম্প অন করে শাশ্বতী অফ করে দেয় ঘরের বাকি আলো। খাটে বসে আইফোনটা হাতে নেয়, কী ভেবে ফোনের সুইচ অফ করে রেখে দেয় বেডসাইড টেবিলের ড্রয়ারে। পায়ের কাছে ভাঁজ করে রাখা হাল্কাফুল্কা ব্ল্যাঙ্কেটটা টেনে গায়ে দেয়। অর্ক যেদিকে বসে আছে, তার উল্টোদিকে মুখ করে শোয় শাশ্বতী।

অর্ক চুপচাপ তাকিয়ে তাকিয়ে পুরোটা দেখে, অথবা কিছুই হয়তো দেখে না। অর্কর মাথাতে এখন হাজার চিন্তা ঘুরপাক দিচ্ছে। চৌষট্টি বছরের অর্ক চাকরিতে এক্সটেনশনে আছে। সামনের বছর তার পাকাপাকি রিটায়ারমেন্ট। অর্কর বিষয় আর্কিটেকচার, এই লাইনে ইচ্ছে হলে অবসর গ্রহণের পরেও সে কাজ করতে পারে। তবে সে মনস্থ করেছিল, আর কাজ করবে না। শাশ্বতীর এত বেড়ানোর শখ! যতদিন মা বেঁচে আছে ততদিন সম্ভব নয়। মা চলে গেলে শাশ্বতীকে নিয়ে সে বেরোবে বিশ্ব ভ্রমণে, পুরো পৃথিবী চষে বেড়াবে, শাশ্বতীর সব অভিযোগ মিটে যাবে এক যাত্রায়।

তবে তার পরিকল্পনায় ছন্দপতন ঘটে গেল তনুর কারণে। তনুর একটা ব্যবস্থা না হওয়া অবধি সে আর শাশ্বতী কেমন করে বিশ্ব ভ্রমণে বেরোয়? শাশ্বতীই রাজি হবে না, উল্টে সারাজীবন না বেড়াতে যাওয়ার কারণ হিসেবে অর্কর মা-র বিরুদ্ধে নালিশের ঝাঁপি খুলে বসবে।

গ্লাসের শেষ ওয়াইনটুকু গলাধঃকরণ করে অর্ক তাকিয়ে থাকে শাশ্বতীর শায়িত শরীরের দিকে। জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে প্রতিটি মানুষেরই বোধহয় সৎ হওয়ার ইচ্ছে চাগাড় দিয়ে ওঠে। আসলে একটা সময়ের পরে নিজের মুখোমুখি দাঁড়ানো যে প্রত্যেকেরই নিয়তি। আজ অর্কর মনে হয়, মা-র বিরুদ্ধে শাশ্বতীর নালিশ সে চিরকালই উড়িয়ে দিয়েছে। তনুর যদি বিয়ে হত, তনুর শাশুড়িও যদি পদে পদে ছেলের বৌকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাতো, কী করতো তনু? আর বাবা হয়ে অর্করই বা কী প্রতিক্রিয়া হত?

বড় অনুশোচনা হয় অর্কর। সে বোঝে শাশ্বতীর শরীরকে সে যতটা ভালবেসেছে, শাশ্বতীর মনের দিকে সে কোনদিনই ততটা ফিরে দেখেনি। এটা কি তাদের সম্পর্কে ভালোবাসার অভাব, নাকি নেগোশিয়েসন ম্যারেজ মাত্রই এই পরিণতি অবধারিত? পরিচয়ের শুরুতেই শরীরের আগল খুলে যায়, তাই মনের প্রবেশ দরজার কথা আর খেয়াল থাকে না?

কতদিন হয়ে গেল শাশ্বতীর শঙ্খের মত সাদা বুক দেখেনি অর্ক, লাল জড়ুলটা স্পর্শ করেনি। আজকাল যাই হয়, সবই গভীর আঁধারে। মনের প্রেম কোনদিনই ছিল না, শরীরের প্রেমও গেছে, পড়ে আছে শুধু জৈবিক দেওয়া-নেওয়া, যা প্রাণী মাত্রই থাকে। সেও আর নিয়মিত হয় কোথায়, শরীরী মিলনেও ভাটা পড়েছে কতকাল। সেই আগের মত দুজনের ইচ্ছেরও আর সমাপতন হয় না। যেদিন শাশ্বতী উসখুসায়, সেদিন হয়তো অর্কর শরীর ভালো নেই বা অফিসে ঝামেলার কারণে তার মেজাজ খারাপ। আবার যেদিন অর্ক হাত বাড়ায়, শাশ্বতী বিড়ালিনীর মত ফোঁস করে রেগে ওঠে।

হাতে ধরা ওয়াইনের গ্লাস সামনের কাঁচের টেবিলে রেখে অর্ক উঠে দাঁড়ায়, বাথরুমে যায়, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে শাশ্বতীর পাশে। শাশ্বতীর গা থেকে ট্যালকম পাউডারের চন্দন চন্দন গন্ধটা প্রবেশ করে অর্কর মস্তিষ্কে। বহুদিন পরে সে শিহরিত হয়, খাড়া হয়ে ওঠে রোমকূপ। তবে সেক্সের ক্ষেত্রে অর্কর ধৈর্য বরাবরই কম, বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র মেনে ওসব ফোর-প্লে তার পোষায় না। সে তার লোমশ ডান হাত ঢুকিয়ে দেয় শাশ্বতীর নাইটির নীচে, বাঁ-হাতে শাশ্বতীকে টেনে শুইয়ে দেয় চিৎ করে।

শাশ্বতী জেগেই ছিল। অদ্ভুত ব্যাপার, শাশ্বতী কোন প্রতিবাদ করে না, আবার শরীরের খেলায় উচ্ছল হয়ে সাড়াও দেয় না, গভীর অন্ধকারে সে চুপ করে পড়ে থাকে পরিণতির প্রতীক্ষায়।

কাজ শেষ হলে আদর্শ স্বামীর মত অর্ক জিজ্ঞাসা করে, "আর ইউ হ্যাপি?"

অবশ্য শাশ্বতীর থেকে কোন উত্তর প্রত্যাশা করে কি অর্ক? সে যেন জানে তার মত সুপুরুষের অঙ্কশায়িনী হয়ে শাশ্বতীর একেবারে বিগলিত অবস্থা। শারীরিক সুখে তৃপ্ত অর্ক পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম আসে না শাশ্বতীর, সে অন্ধকারে প্যাঁচার মত চোখ চেয়ে জেগে থাকে। কত শত কথা ভিড় করে মনে।

শৈশব, কৈশোর, যৌবন চোখের পলকে ফুরিয়ে গেল যেন। উনষাট বছর বয়সে পৌঁছে শাশ্বতীর মনে হয়, জীবন নামক গাড়িটি ট্র্যাফিক রুল মেনে চালিয়ে এমন কি লাভ হল তার? ষোলো বছর বয়স থেকেই শাশ্বতী জানে, সে অপরূপা, তার দারুণ শ্বশুরবাড়ি হবে, এক অচিন দেশের রাজকুমার ঘোড়ায় চেপে এসে হরণ করে নিয়ে যাবে রাজকন্যা সম রূপসী শাশ্বতীকে।

মোট তিন জন পাত্র দেখেছে শাশ্বতীকে। প্রথম পাত্র যখন দেখতে এসেছিল, সে তখন কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে। অবিনাশ বাতিল করে দেয় সেই পাত্র, ছেলের মাথায় চুল কম ছিল। দ্বিতীয় পাত্রের খোঁজ এনেছিল পিসী। যথারীতি মেয়ে দেখে পাত্র পক্ষের খুব পছন্দ হয়। তবে একটা অদ্ভুত আব্দার করেছিল তারা, শাশ্বতীকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় কাটাতে অনুরোধ করেছিল পাত্রের সঙ্গে। সিদ্ধার্থ রেগে বলেছিল, "মজাক নাকি, চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবী উল্টে যেতে পারে।"

তৃতীয় পাত্র এই পরিবার, মানে অর্ক।

বিয়ের দিন শাশ্বতীকে চন্দন পরিয়েছিল রুমিদি। রুমিদির দারুণ আঁকার হাত। শাশ্বতীর কপালে চন্দনের নিখুঁত কলকা আঁকার পর, আদর করে শাশ্বতীর থুতনি ধরে বলেছিল, "তোকে কী সুন্দর লাগছে রে মিঠু! অর্করও খুব ম্যানলি চেহারা। তোদের দুটোতে দারুণ মানাবে।"

চারুমাসি ফোড়ন কেটেছিল, "শ্যামলা বর, গোরা বৌ, একেবারে রাধাকেষ্ট।"

শাশ্বতীর পাশে বসে ছিল পর্ণা। শাশ্বতীর হাতে চিমটি কেটে ফাজিল পর্ণা বলেছিল, "রাধাকেষ্টর লাভ স্টোরি কিন্তু পুরো প্লেটোনিক। তোর কী হবে রে শাশ্বতী!"

অন্ধকারে প্যাঁচার মত জেগে থাকা শাশ্বতীর বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস পড়ে, পাশে শুয়ে থাকা লম্বা চওড়া অর্কর দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবে, প্লেটোনিক লাভ শাশ্বতী নিজেও চায়নি, তাই বলে বিছানায় এত জান্তব ব্যবহারও তো কাম্য ছিল না।

শাশ্বতীর মনে পড়ে রেস্টুরেন্টে পর্দা ঘেরা কেবিনে বসে সোমনাথের সঙ্গে কাটলেট খাওয়ার স্মৃতি। অন্ধকারেও তার মুখে ফুটে ওঠে এক টুকরো মধুর আলো। সে ব্যস্ত হয়ে তাকায় ঘুমন্ত অর্কর প্রতি। না, ভয় নেই, অর্ক ঘুমোচ্ছে, অর্ক দেখেনি শাশ্বতীর মুখে চাঁদের হাসি। তবু সাবধানের মার নেই, সে অর্কর দিকে পিছন করে পাশ ফিরে শোয়, পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়েও পড়ে।

(চলবে)

স্বপ্না মিত্র একজন প্রবাসী বাঙালি। বিজ্ঞানের ছাত্রী। রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে রেডিও-ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স নিয়ে বি-টেক করে বেশ কিছুদিন দেশি এবং বহুজাতিক সংস্থায় কাজ করেছেন। চিরদিনই হার্ডকোর হবি ছিল রিডিং, লেখালেখি ছিল একান্তই ব্যক্তিগত ভালোবাসার জায়গা। ইদানীং বেশ কিছু লেখা আত্মপ্রকাশ করেছে প্রিন্টেড ম্যাগাজিনে (দেশ, সানন্দা, সাপ্তাহিক বর্তমান, বর্তমান, আনন্দমেলা, বাংলা ফেমিনা, আনন্দবাজার, আজকাল), বিভিন্ন ওয়েব ম্যাগাজিনে এবং বই হিসেবে।

Book Review

These Precious Days — Ann Patchett

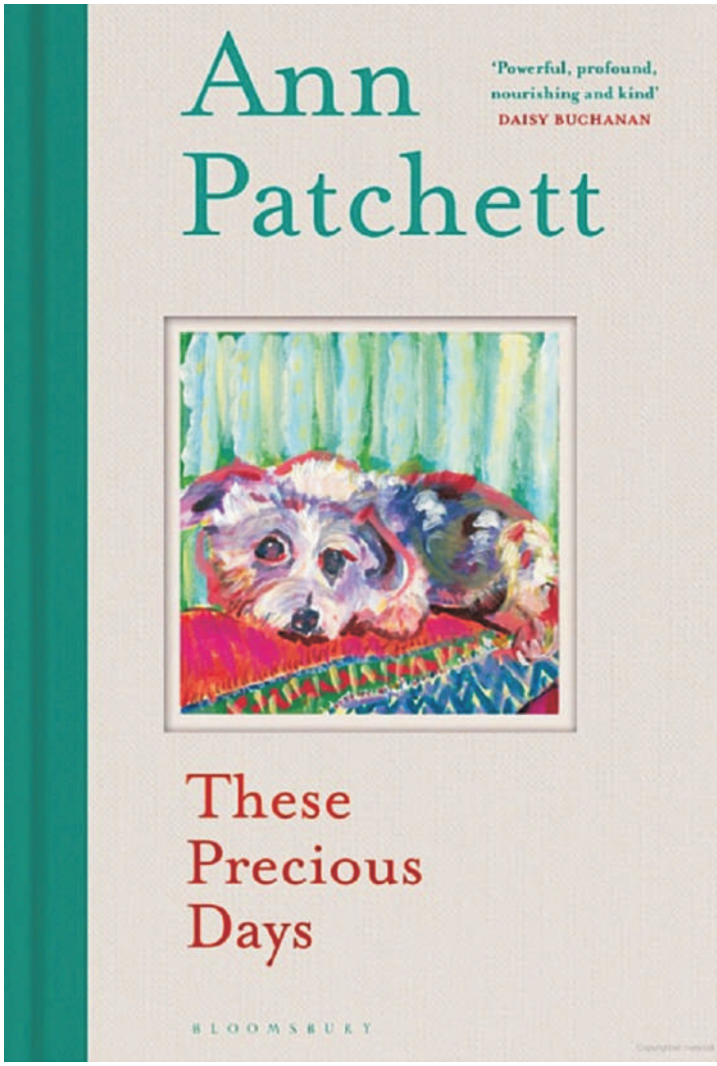

বৃহস্পতিবার দুপুরের নিয়মমাফিক মিটিং শেষ। মিটিং ঘরের বাইরে বেরোতেই এক সহকর্মী এগিয়ে এলেন হাসিমুখে। হাতে একটি বই। সামান্য সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, "আমি একজনকে এই বইটা পড়তে দিতে চাই। তোমার বইপড়ার অভ্যেস আছে জানি। তুমি পড়বে please বইটা ?"

তৃষ্ণার্ত কোন মানুষকে যদি কেউ এক গ্লাস সুশীতল জল এনে জিজ্ঞাসা করে যে সে জল পান করবে কিনা এ হল অনেকটা সেইরকম। কেউ আগ্রহ করে নিজের ভাললাগা বইটি পড়াতে চাইছেন। সহকর্মীর প্রশ্নের উত্তরে তাই হ্যাঁ ছাড়া যে অন্য কিছু বলা যেতে পারে একথা মাথাতেই আসে নি। ভারী ভাল হল তাতে। চমৎকার একটি বই পড়লাম। নাম These Precious Days, লেখিকা Ann Patchett. ছোট প্রবন্ধের সংকলন একটি। লেখকের অন্যান্য উপন্যাস (তার মধ্যে Bel Canto সবথেকে ভাল লেগেছিলো) পড়েছিলাম। কিন্তু প্রবন্ধ পড়িনি। ঝরঝরে ভাষা। রচনাগুলি মূলত আত্মজীবনীমূলক হলেও কিভাবে যেন ব্যক্তিজীবনের পরিসর ছাড়িয়ে যায়। পাঠক নিজের অভিজ্ঞতাও অনুভূতির প্রতিফলন দেখেন লেখাতে। তাই লেখক-পাঠক সংযোগ তৈরী হতে বিলম্ব হয় না মোটেও। বইয়ের শেষের দিকে একটি প্রবন্ধ "A Talk To The Association Of Graduate School Deans" আর সেখানে দু-তিনটি বাক্য মনের গভীরে প্রবেশ করল। তিনি লিখছেন,

"I promote the books I love tirelessly, because a book can so easily get lost in the mad shuffle of the world and it needs someone with a loud voice to hold it up praise it. I am that person. As every reader knows, the social contract between you and a book you love is not complete until you can hand that book to someone else and say,' Here, you're going to love this."

এ যেন বইপ্রেমীদের ইস্তেহার। সত্যিই তো – আমাদের অস্থিরতায় আর ব্যস্ততায় ভরা জীবনে বইএর কথা মনে রাখা কি সহজ ? বই তাই হারিয়েই যায়। যে বই পড়ে ভাল লাগে সেটির কথা বারেবারে বলা ও অন্যান্য গ্রন্থভক্তদের সেটির কথা জানান -এটুকু দায়বদ্ধতার প্রত্যাশা নিষ্ঠাবান পাঠকদের কাছে করাই যায়। বেঁচে থাকে বই। আর ভাল বই পড়ে মনের আনন্দে বাঁচুন সকলে।

A Gentleman In Moscow — Amor Towles

রাশিয়া দেশটি এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। আমার ছোটবেলায় সে দেশকে বলা হত সোভিয়েত রাশিয়া বা সোভিয়েত দেশ। সত্তরের দশকের শেষাশেষি ও বিশ্বায়নের এমন রমরমা ছিল না। সোভিয়েত দেশের সঙ্গে আমার পরিচয়ের যোগসূত্রটি ছিল বইমেলায় 'ভস্তক' এর স্টল। ব্যাস, ঐটুকুই। যতদিন না ক্লাস এইট, নাইন-এ উঠি ততদিন পর্যন্ত সোভিয়েত দেশ মানেই তাই দৃষ্টিনন্দন কিছু বই। সুন্দর কাগজ, চমৎকার বাঁধাই আর ঝকঝকে ছাপা। গোগোল নামটা অবশ্য পরিচিত ছিল। তার কারণ দেব সাহিত্য কুটির থেকে প্রকাশিত বড় আর বাঁধানো পূজাবার্ষিকীতে প্রকাশিত সমরেশ বসুর ছোটদের জন্য লেখা রহস্য গল্পগুলি। সেসব গল্পের মূল চরিত্রের নাম গোগোল। একটু অন্যরকম নাম। মাকে এ নামের মানে জিজ্ঞাসা করতে মা বলে দিয়েছিলেন গোগোল হলেন রুশ দেশের একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক। তলস্তয়, পুশকিন, চেকভ – তাঁদের সঙ্গে পরিচিতি অনেক পরে। তবে রাশিয়া সঙ্গে থেকেই গেছে কোন না কোনভাবে মনের অবচেতনে।

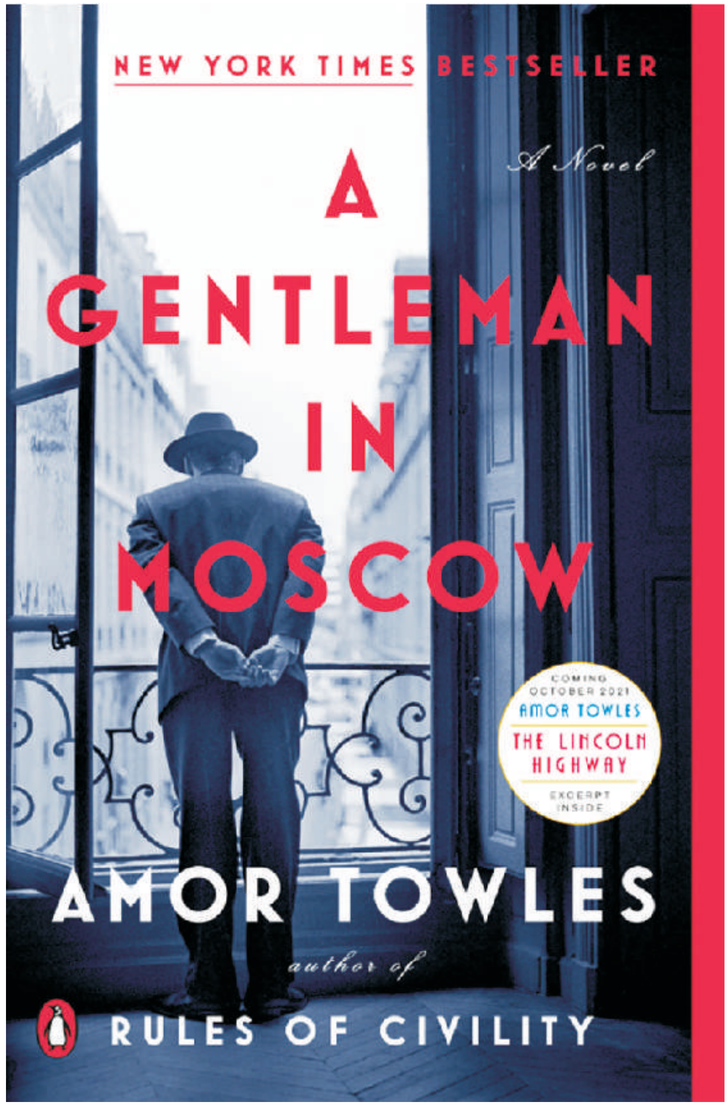

A Gentleman In Moscow বইটির নাম শুনি আমার এক সহকর্মীর কাছে। আবার রাশিয়া। বই পড়ার ঝোঁকটি আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি আমার মা এর কাছ থেকে। আমার কন্যেটিও পেয়েছে তার মা, দিদার কাছ থেকে। বইয়ের নামটি শোনার কিছুদিন পরে দেখি আমাদের বসার ঘরের টেবিলে সে বই। ব্যাপার কি ? জানা গেল মেয়ে সে বই কিনে এনে শুরু করেছিল পড়তে। কিন্তু কিছুটা পড়ে থেমে গেছে। সেটা প্রায় ২০২০র মাঝামাঝি। অতিমারীর প্রকোপে গৃহবন্দী আমরা। এই বন্দীদশার সঙ্গে নাকি বইয়ে বর্ণিত পরিস্থিতির কিছু সাদৃশ্য আছে। তাই পাঠ আর এগোয়নি তার। এবারে আমি শুরু করলাম পড়তে।

১৯২২ সাল। Count Alexander Ilyich Rostov এর বিচার হচ্ছে বলশেভিক ট্রাইবুনাল এ। তাঁর অপরাধ হল বিপ্লববিরোধী একটি কবিতা লেখা। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হন তিনি। কিন্তু তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়া সম্ভব হয় না কারণ বিপ্লবীদের (তাঁদের কেউ কেউ আবার এখন বড় দরের দেশ নেতা) মধ্যে তাঁর বেশ কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী আছেন। পরিবর্তে তাঁকে যাবজ্জীবন গৃহবন্দিত্বের শাস্তি দেওয়া হল। পাঠান হল Metropol হোটেলে। আর Count Rostov এর সঙ্গে পাঠকেরাও প্রবেশ করল সেই হোটেলে। পরবর্তী ত্রিশ বছর থেকেও গেল তারা সেখানে। Hotel Metropol তার অতিথি, কর্মচারী, বলরুম, অতিথিদের থাকার ঘর, সিঁড়ি, বারান্দা, কার্পেট – সবকিছু নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠল বইয়ের

পাতায় পাতায়। ক্রমশঃ বড় থেকে আরও বড় হয়ে উঠল Metropol. শুধু setting নয়, হয়ে উঠল এ কাহিনীর বিশেষ এক চরিত্র। ইতিমধ্যে স্তালিন জমানায় বাইরে চলেছে ঘটনার ঘূর্ণাবর্ত – দুর্ভিক্ষ, সাইবেরিয়া প্রেরণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ – রাশিয়া কৃষিনির্ভরতা থেকে বেরিয়ে শিল্পনির্ভর দেশ হওয়ার পথে হাঁটছে। বৈপ্লবিক বদল ঘটে যাচ্ছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে। সাহিত্যের দুনিয়ায় তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছে।

"Bulgakov had not written a word in years. Akhmatova had put down her pen. Mandelstam, having already served his sentence, had apparently been arrested again. And Mayakovsky ?" Metropol এর দরজা খোলা বন্ধ হওয়া আর অতিথিদের আসা যাওয়ার সাথে সাথে এ সবকিছুর আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। পড়তে পড়তে নিজেদের পরিবেশ ভুলে যেতে হয়। যেন Kremlin এর উল্টোদিকে Metropolই আমাদের ঘরবাড়ী। Count তো বটেই, Anna Urbanova, Nina, Andrey – সকলকেই মনে হয় কত চেনা।

এই কাহিনীর নায়ক Alexander Rostov এক আশাবাদী চরিত্র। গল্পের কথকও তিনি। তাই ইতিহাসের অন্ধকার সময়ও পাঠকের মনকে ভারাক্রান্ত করে না। কাহিনী এগিয়ে চলে সজীব, সরস ভঙ্গিমায়। Metropol এর বাইরে তৎকালীন রাশিয়ার ঘটনাবলীর সঙ্গে সমতা রাখার জন্য লেখক Amor Towles ভারী দক্ষতার সঙ্গে একটি তৃতীয় ব্যক্তিকে হাজির করেছেন বইতে। তার উপস্থিতি শুধু লম্বা লম্বা পাদটীকায় (footnote)। সে চারপাশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে তার বক্তব্য রাখছে। Count এর আশাবাদের বিপ্রতীপে তার কণ্ঠে cynicism সুস্পষ্ট।

বইটি পড়ার অভিজ্ঞতা এককথায় মনে দাগ কাটার মতো। বেশ অনেকদিন পরে এমন একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়লাম যেটি আবার একবার পড়ার ইচ্ছে রইল। উপরি পাওনা ? রাশিয়ান ক্লাসিক্সগুলি ঘুরে দেখার তীব্র আগ্রহ। A Gentleman In Moscow – বইপ্রেমী বন্ধুদের বিশেষ অনুরোধ পড়ার জন্য। বইয়ের প্রচ্ছদ বা অঙ্গসজ্জার সঙ্গে কিন্তু ছোটবেলায় কেনা 'ভস্তক' থেকে প্রকাশিত 'রুশ দেশের উপকথা'র বিশেষ মিল নেই। কিন্তু তাতে কি আসে যায় ? বই যে সবসময় তার প্রচ্ছদ দিয়েই বিচার করতে হবে এমন কোন কথা নেই, সে যে যাই বলুন না কেন।

– রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

বাতায়নে প্রকাশিত বই

আমাদের জীবন স্বাদ, বর্ণ গন্ধ আর স্পর্শের বৈচিত্র্যে ভরপুর। কখনো সেখানে উপচে পড়ে কুসুম কুসুম নরম রোদের পেয়ালা। কখনো সেখানে বেজে ওঠে টুং টাং জলতরঙ্গের স্বর। কখনো আবার জীবনের স্বাদ "রেনবো কালারের আইসক্রিম" এর মতো। এই বইয়ের গল্পে ধরা পড়েছে জীবনের স্ন্যাপসট। গল্পের পটভূমি কখনো গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন, কখনো কুইন্সল্যান্ড, কখনো কলকাতা। এ বইতে একটা সুতো হল শিকড়ের প্রতি টান, আর অন্যসুতো প্রবাসজীবনের প্রকৃতি ও সমাজ। এই দুইসুতোর বুনুনিতে ফুটে উঠেছে জীবনের রকমারি নকশা। সহজ ভাষায় এক নিরন্তর এক অনুসন্ধান।

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

অচেনা অজানা পথিকের মত গল্পের পাখিরা অনন্তের দিকে উড়ে যায়।

সেইসব প্রিয় পাখিদের কে খুঁজেছিল ?